প্রিয় শহরকে নতুন করে জানা

যুগশঙ্খ SUPPLI

কলকাতা

সোমবার, ২৯ মে ২০১৭

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

এখন যে যেমন পারছে নিজের সেলফি তুলে পটাপট সাঁটিয়ে দিচ্ছে ফেসবুকের দেওয়ালে। আর সেই ফোটো যদি কোনও মহিলার (যতই কুৎসিত হোক না কেন) হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কমেন্টস পড়তে শুরু হয়— ‘দারুণ’, ‘কিউট’, ‘অসাধারণ’, বেশ মিষ্টি’ ইত্যাদি ইত্যাদি। তেমনই এই ফোটোটায় ‘সোনার সংসার’ ক্যাপশন লেখা হলে অনেকেই বিদ্রূপের হাসি হাসবেন। তবুও এটাই ওঁদের কাছে সোনার সংসার। কারণ খোলা আকাশের নীচে রাস্তার এককোণে আশ্রয় নিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়েছে নিজের সংসার, সঙ্গে ঠাঁই দিয়েছে দেবতাকেও...

ফোটো: **রাজশেখর পাল** | লেখা: **শর্মিলা চন্দ্র**

আমার চোখে কলকাতা

পি সি সরকার (ম্যাজেশিয়ান)

কলকাতা কথাটা একটা ম্যাজিকের মতো। কলকাতার চৌহদ্দিটা যে কতটা... কোথায় কলকাতার শুরু কোথায় শেষ আমি জানি না, জানা সম্ভবও নয়। তার কারণ এর কোনও পাঁচিল নেই সীমানা নেই। হঠাৎ করে যদি পুলিশের পোশাক পরিবর্তন হয়ে গেল, তখন বুঝতে পারি আমি কলকাতার বাইরে রয়েছি। মানুষের সাথে মেলামেশা করলেই বুঝি কলকাতার বাইরেও কলকাতা, ভেতরেও কলকাতা— কলকাতা আছে কলকাতাতেই’। কলকাতা কারওর কাছে ‘কলকাত্তা’ আবার কারওর কাছে ‘কইলকাতা’। ইংরেজরা তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাবার জন্য এই অঞ্চলকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভেবেছিল, কারণ এখান থেকে হঠাৎ করে যেমন সুন্দরবনে হারিয়ে যাওয়া যায়, তেমনি হঠাৎ করে ইংল্যান্ডে জাহাজ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়। সেই জন্যই জব চার্নক অনেক ভেবে-চিন্তেই জায়গাটা নির্বাচন করেছিলেন। মোঘলরাই তো ইংরজের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল, তাই মোঘলদের দমন করার পর ভরকেন্দ্রটাকে সরিয়ে নেবার কথা ভাবল ইংরেজরা। কারণ কলকাতা সত্যিকারের একটা বিপজ্জনক জায়গা। এখানে সৈনিকরা জন্মেছেন, বহু প্রতিবাদী কণ্ঠ এখান থেকে উঠেছে। সুতরাং Calcutta cannot be the capital of India. কলকাতার পুরনো ঐতিহ্যকে বা ইতিহাসকে সঠিকভাবে জানতে গেলে ইংরেজদের লেখা একদমই পড়া যাবে না।

আমরা এখনও নির্বোধের মতো কলকাতাকে চিহ্নিতকরণ করি মনুমেন্ট দিয়ে, ভিক্টোরিয়া দিয়ে, মিউজিয়াম দিয়ে বা সাম্প্রতিককালে বিগবেনের হাস্যকর বেঁটে বামনের মূর্তিটি দিয়ে। ইংরেজরা চলে গেলেও তার প্রভাব আমরা এখনও কাটাতে পারিনি। সেইজন্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস এয়ারপোর্টটাকেও বুক চিতিয়ে বসু বলতে পারলাম না। একসময় মরাঠা আক্রমণ আটকাতে ইংরেজরা যে মরাঠা ডিচ খনন করেছিল তাই পরবর্তীকালে ভরাট করে হয়েছে লোয়ার সারকুলার রোড। আরও মজার কথা যে রাস্তায় বিপ্লবীদের দিনে-দুপুরে ফাঁসি দেওয়া হতো আমরা সেটাকে ফ্যান্সি স্ট্রিট করে দিয়েছি। আমার মনে হয় কলকাতা সবচেয়ে কসমোপলিটন জায়গা। *এরপর তিনের পাতায়*

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

সবাই সমান নন, কেউ কেউ...

সৌরভ মণ্ডল

আমার অফিস যাওয়া আর আসার পথটা বেশ ঘোরালো। প্রথমে ট্রেন, তারপর মেট্রো, তারপর ফের একটা অটো। বাকি জার্নিটা ঠিক থাকলেও, অটোওয়ালাদের মাঝে মাঝে মনে হয় দয়া করে বোধহয় নিয়ে যাচ্ছে, এমন অ্যাটিটিউড।

টালিগঞ্জ মেট্রোতে নেমে কবরডাঙার অটোর লাইনে দাঁড়িয়ে তখন আকাশ-পাতাল ভাবছি। মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে শনিবার ফেলে আসা পেন্ডিং কাজের হিসাব। একে তো ফুটন্ত ম্যাগমার মতো গরম বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর এত লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা!

এই লাইনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় প্রত্যেকটা লোকই ভাবে যেন কোনও অটোর পাঁচ নম্বর ব্যক্তিটি না হতে হয়। আর আমার এমনই কপাল প্রায় রোজই আমাকে পাঁচ নম্বর ব্যক্তিই হতে হয়। যথারীতি পাঁচ নম্বর ব্যক্তি হয়ে এদিনও কোনওক্রমে সাইডের সিটটাতে বসেছি। অর্ধেক শরীরটা বাইরে ঝুলছে।

অটোতে মিনিট তিরিশেক লাগে আমার অফিস পৌঁছতে। সেদিনের গরমটা অন্যদিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি ছিল। সুয্যিমামা যেন তার সমস্ত রাগ উগড়ে দিচ্ছে। সাইডের সিটটাতে বসে মুখের মাস্কটা দু’চারবার টেনে একটু ঠিকঠাক করে নিচ্ছি। মেট্রো আর অটোতে কখনও-সখনও পরিচিত দু-চারজনের সাথে দেখা হয় বটে, তবে এমনিতে অভ্যাস এমন দাঁড়িয়েছে খুব প্রয়োজন না হলে পাশের সিটের লোকটার মুখও দেখা হয় না। যথারীতি সেদিনও তাই। হঠাৎ পিছনের সিটের মাঝখানে বসে থাকা বয়স্ক ভদ্রমহিলা বুক ধরে ছটফট করতে লাগলেন। অটোটা রাস্তার একপাশে দাঁড় করানো হল। বাকি সব যাত্রীদের মতো আমিও বিচলিত হলাম। জানি না তার কারণ কী ছিল; ওই মহিলার অসুস্থতা না অফিস যাবার তাড়া! চুল লাল করা অটো-ড্রাইভার গুটখা চিবোতে চিবোতে মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি একাই বেরিয়েছেন? আপনার সঙ্গে কেউ নেই?’ মহিলা

ততক্ষণে আরও ছটফট করছেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, ‘না।’ প্রচণ্ড বুক-যন্ত্রণা নিয়ে মহিলা আর বসে থাকতে পারলেন না এলিয়ে পড়লেন। সেই মুহূর্তে এক যাত্রী ফোনে কথা বলছিলেন, কাকে যেন বলছেন, ‘ধুস! আর ভাল্লাগে না, যত সব ঝামেলা আমি রাস্তায় বেরোলেই হয়...।’ ততক্ষণে অটো-ড্রাইভার সবাইকে বলে দিল, ‘আপনারা একটা অন্য অটো ধরে চলে যান। এঁকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।’ আশ্চর্যের ব্যাপার হল টাকা দিতে যখন গেলাম নেয়নি, বলল আপনি পরের অটো ধরে চলে যান না হলে দেরি হয়ে যাবে।

পরের অটো ধরে অফিস গেলাম ঠিকই, তবে মনের ভেতর একটা চাপা আলোড়ন চলছিল। বারবার মনে হচ্ছিল একজন-দুজনকে দেখে সবাইকে বিচার করা ঠিক নয়... মানবিকতাবোধ কারও কারও আছে।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৯ মে ২০১৭

থার্ড আই-এর ভিস্যুয়াল আর্ট উৎসব

২৬ মে থেকে গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায় শুরু হয়েছে থার্ড আই-এর ১৮-তম ভিস্যুয়াল আর্ট উৎসব। প্রথম ও দ্বিতীয় তল জুড়ে ভারতবর্ষের প্রথম এবং একমাত্র ফোটোগ্রাফি উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায় উদ্‌যাপিত হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে। প্রদর্শনীটি চলবে আগামী ৩১ মে পর্যন্ত।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রশিল্পী অতনু পাল সহ থার্ড আই সদস্যদের ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, পপুলার ফোটোগ্রাফিসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রদর্শিত, পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলির পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন ছবিও রাখা হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। এই কারণেই প্রদর্শনীটির শিরোনাম 'ফিরে দেখা'।

থার্ড আই-এর কর্ণধার অতনু পাল-এর কথায়, এটি সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় চিত্র প্রদর্শনী। কারণ দুটো ফ্লোর নিয়ে এর আগে কোনও এগজিবিশন হয়নি। এখানে প্রতিটি ছবি বড় মাপের আর্কাইভাল ক্যানভাসে প্রিন্ট করা। কোনও পেপার প্রিন্ট নেই। পাশাপাশি তিনি জানান, ২০১৯ পর্যন্ত কলকাতায় এত বড় প্রদর্শনী হবে না। হবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিদেশে। ২০২০-থেকে কলকাতায় আবার বড় মাপের এগজিবিশন হবে।

পুরনো বাড়ি @ কলকাতা

ডাচ উদ্ভিদবিজ্ঞানীর পরিকল্পনায় ভারতীয় জাদুঘর

শঙ্খ রায়

অজানাকে জানার আর অদেখাকে দেখার ইচ্ছে মানুষের চিরদিনের। আর দুষ্প্রাপ্য-দুর্মূল্য জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা অনুসন্ধিৎসা নেই এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। সেই আকাঙ্ক্ষা বা অনুসন্ধিৎসার বশেই জাদুঘরের জন্ম। কলকাতা শহরের প্রাচীন ঐতিহ্যগুলির মধ্যে কলকাতার জাদুঘর অন্যতম। জাদুঘরের আর এক নাম 'সংগ্রহশালা'। জাদুঘর বা সংগ্রহশালা হল এমন একটি বাড়ি যেখানে পুরনো জিনিস অত্যন্ত যত্নসহকারে সংগৃহীত থাকে।

বাংলায় 'জাদুঘর' শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ 'আজায়ব ঘর' থেকে। ইংরেজিতে 'Museum' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ থেকে। শব্দটির মূল উৎপত্তি গ্রিক শব্দ 'Meseums' থেকে। যার অর্থ গ্রিক পুরাণের শিল্পচর্চার পৃষ্ঠপোষক মিউজদের মন্দির। এ তো গেল জাদুঘরের নাম কেন জাদুঘর সেই গল্প। কোথা থেকে, কীভাবে, কারা তৈরি তৈরি করেছিল এই কলকাতার জাদুঘর জানতে গেলে ফিরে যেতে হবে ইতিহাসের পাতায়।

সময়টা ১৭৮৪ সাল, স্যার উইলিয়াম জোন্স তৈরি করেন 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'। 'এশিয়াটিক সোসাইটি'-র সদস্যরা অনেক পুরনো জিনিস সংগ্রহ করেছিলেন। ধীরে ধীরে এশিয়াটিক সোসাইটিতে জমে উঠছিল অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষ একটি সংরহশালা তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। ড. নাথানিয়েল ওয়ালিচ, উদ্ভিদবিজ্ঞানী হলেও যাঁর ঝোঁক ছিল প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সংগ্রহের। তিনি ডেনমার্ক থেকে শ্রীরামপুর হয়ে কলকাতা এলেন সেই সময়ে। এই উদ্ভিদবিজ্ঞানী সোসাইটিকে প্রস্তাব দিলেন 'ওরিয়েন্টাল মিউজিয়াম অব এশিয়াটিক সোসাইটি' নামে যদি একটি মিউজিয়াম করা হয় তাহলে তিনি তাঁর যাবতীয় সংগ্রহ সেখানে দান করে দেবেন এবং স্বেচ্ছা-শ্রম দেবেন মিউজিয়াম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। তৎকালীন ভারত সরকার চৌরঙ্গির কাছে জায়গা বরাদ্দ করে জাদুঘর তৈরির জন্য।

১৮১৪ সালে ডাচ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ড. নাথানিয়েল জাদুঘর তৈরির একটি পরিকল্পনা করেন। তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন। তিনি তাঁর চিঠিতে জানান যে এই জাদুঘরের দু'টি বিভাগ তৈরি করা প্রয়োজন। একটি বিভাগ হবে পুরাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক এবং অপর বিভাগটি ভূতাত্ত্বিক ও প্রাণিতাত্ত্বিক। ওই উদ্ভিদবিজ্ঞানীর পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮১৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মিউজিয়ামের শুভ সূচনা হয়। মিউজিয়াম তৈরির পিছনে ডাচ বিজ্ঞানীর ওই অবদানের কথা মাথায় রেখে ১ জুন ১৮১৪ সালে তাঁকে সাম্মানিক কিউরেটর পদে নিযুক্ত করা হয়। শুধু তৈরিতেই নয়, পরবর্তীকালেও ড. ওয়ালিচের জাদুঘরের জন্য উদ্যোগ ছিল চোখে পড়ার মতো। তিনিই জাদুঘরকে সবচেয়ে বেশি সামগ্রী দান করেছিলেন। পরবর্তীকালে ড. ওয়ালিচ পদত্যাগ করার পর মাসিক বেতনে কিউরেটর নিযুক্ত করা হয়। ইউরোপীয়

সংগ্রাহক ছিল অনেক। তবে তৎকালীন একমাত্র বাঙালি সংগ্রাহক ছিলেন বাবু রামকমল সেন। তিনি পরবর্তীকালে সচিব পদে নিযুক্ত হন।

১৮৩৬ সালে ব্রিটিশ সরকারের মিউজিয়াম অ্যাক্ট পাশ হলে তৎকালীন সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে এশিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়ামের সব সংগৃহীত জিনিসকে নবনির্মিত একটি মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত করা হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৮৫৭ সালে নতুন মিউজিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর করা হয়। কাজ শেষ হয় ১৮৭৫ সালে। নতুন মিউজিয়ামের কর্ণধার ছিলেন তিনজন বিজ্ঞানী— অ্যান্ডারসন, আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম এবং এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন সেক্রেটারি রাজা রাজেন্দ্র পাল।

১৯১৬ সালে জ্যুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অনুদানে জাদুঘরে প্রাণিতত্ত্ব বিভাগ এবং ১৯৪৫ সালে নৃতত্ত্ব বিভাগ চালু হয়। আজ মিউজিয়ামে ৬টি বিভাগ আছে। কিন্তু শুরুর দিকে মাত্র দুটি বিভাগ ছিল। বর্তমানে জাদুঘরে সংগৃহীত রয়েছে মিশরীয় মমি, অশোক স্তম্ভ, ভারহুতের বৌদ্ধস্তূপ, প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের ফসিল, দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন সামগ্রী, মানব বিবর্তন, বুদ্ধের জীবনাদর্শাবলি, বুদ্ধমূর্তি, বিভিন্ন পাথরের সংগৃহীত ঘর। বর্তমানে জাদুঘর তার বুকে অসংখ্য সম্পদ নিয়ে থেমে থাকেনি। বর্তমানে মানুষের কৌতূহল মেটানোয় মিউজিয়াম এক অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

আকাশ থেকে কত তারা, নক্ষত্র যে খসে পড়েছে মানুষ কি তার হিসাব রাখে? ঠিক তেমনই কত মানুষের পরিশ্রম ও আশার ফসল আজকের এই মিউজিয়াম, তা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না, কিন্তু মিউজিয়াম তার বুকের মধ্যে সেই ডাচ বিজ্ঞানী ও অন্যান্য মানুষের স্মৃতি বহন করে চলেছে।

ব্যক্তিত্ব @ কলকাতা

হাংরিয়ালিস্ট ফাল্গুনী রায়

বুদ্ধদেব হালদার

ইতালির প্রেস তাঁকে ভারতীয় র‍্যাঁবো আখ্যা দিয়েছিলেন। সামান্য কয়েকটি কবিতার মাধ্যমেই তিনি অনায়াসে বাংলা কবিতার গভীরে রক্তক্ষরণ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনিই হাংরিয়ালিস্ট কবি ফাল্গুনী রায়। মাত্র ১৩ বছরের সাহিত্য জীবন তাঁর। ৭ জুন ১৯৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বনবিহারী রায় ও মাতা বকুলরাণী রায়ের পঞ্চম সন্তান তিনি। বিখ্যাত কালীশঙ্কর রায়ের বংশধর। কলকাতার রতনবাবু রোড আর রতনবাবু ঘাট মহাশ্মশান তাঁরই পূর্বপুরুষ রামরতন রায়ের নামাঙ্কিত। ফাল্গুনী রায়ের প্রকৃত নাম নারায়ণচন্দ্র রায়। তাঁদের ইউনিভার্সাল ছোড়দি পূরবী গুহ তাঁকে 'ফাল্গুনী' নামে ডাকতেন এবং ওই নামেই পরবর্তীকালে তিনি ষাটের দশকের বিশিষ্ট হাংরি কবি হিসাবে পাঠকের কাছে বিতর্কিত ও বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। অপর এক বিখ্যাত কবি তুষার রায়, সম্পর্কে তাঁর বড়দা হতেন।

জীবিতাবস্থায় তাঁর মাত্র একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। হাফ ক্রাউনের ১৬ পৃষ্ঠার এই বইটির প্রকাশকাল ১৫ আগস্ট ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ। বিশিষ্ট গদ্যকার বাসুদেব দাশগুপ্ত এই বইটি প্রকাশ করেছিলেন। ফাল্গুনী রায়ের এই 'নষ্ট আত্মার টেলিভিশন' বইটির ফোর্থ কভারে লেখা ছিল, কবিতা রাজনৈতিক ইস্তেহার নয়, জীবনের ইতিহাস— সেই জীবন যা জগৎ ও মানসজগতের সেতুবন্ধ— জীবনানন্দ যে সব শূকরীর প্রসব বেদনার

আড়ম্বর চোখে দেখেছিলেন, যে সব শূকরীর চিৎকার কানে শুনেছিলেন, তাদের সন্ততিরা— সন্ততির সন্ততিরা আমার চারপাশে এখন চিৎকার করছে— আমি জানি না আমার কবিতা দিয়ে সেই চিৎকার থামানো যাবে কি না। বইটি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে কবি উৎপলকুমার বসু লিখেছিলেন, 'নষ্ট আত্মার টেলিভিশন' বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার যুগটির পরিসমাপ্তি সূচনা করে।

বস্তুত একটি অস্থির সময়ের এক বিষণ্ণ যুবক তিনি। 'জেব্রা-২'-এ তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। এবং বলাই বাহুল্য হাংরি জেনারেশনের লিফলেটগুলি তাঁকে এই আন্দোলন সম্পর্কে সেসময় আগ্রহী করে তুলেছিল। সর্বমোট ৪২টি কবিতা ও ৬টি গদ্য তিনি লিখেছিলেন। 'উন্মার্গ' , 'ফুঃ', 'ক্ষুধার্ত' ও 'হাংরি বুলেটিন' সহ বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। ১৯৭৫-এ 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'কাঠের ফুল' গল্পটি যা তাঁকে এক নতুন পরিচিতি প্রদান করেছিল।

'সম্প্রতি' পত্রিকায় কবি বিনয় মজুমদারের একটি কাব্যগ্রন্থ আলোচনা করতে গিয়ে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সর্বপ্রথম হাংরি জেনারেশন সম্পর্কে একটি ধারণা দেন পাঠককে। ১৯৬২ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই আন্দোলনে যোগ দেন উৎপলকুমার বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, মলয় রায়চৌধুরী প্রমুখ। কিন্তু তাঁদের এই ইস্তেহারভিত্তিক অনিয়ন্ত্রিত আন্দোলনের আয়ু খুবই সংক্ষিপ্ত। মাত্র চার বছরের (১৯৬১-১৯৬৫)। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই ইস্তেহারকেন্দ্রিক হাংরি আন্দোলনের বিপরীতে শৈলেশ্বর ঘোষ, সুবো আচার্য, প্রদীপ চৌধুরী, সুভাষ ঘোষ, বাসুদেব দাশগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিক প্রকৃত হাংরি আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এঁরা সাহিত্যে কোনও ফতোয়া বা ম্যানিফেস্টোতে বিশ্বাস রাখতেন না। এবং পরবর্তীকালে কবি ফাল্গুনী রায় এই দলেই প্রথম হাংরি হিসাবে যোগদান করেন।

যে বাংলা সাহিত্য রোমান্টিসিজম ও র‍্যাশনালিজমে বহুদিন আচ্ছন্ন ছিল, তাকে সজোরে উৎখাত করেছিলেন তিনি। তাঁর কবিতায় আমরা খুঁজে পাই ১৯৬৮ থেকে ১৯৬৯ সালে শহরাঞ্চলে ঘটে যাওয়া ট্রামভাড়া ও খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির মতোই আরও সব বহু বহু আন্দোলনের ভাষাচিত্র, যার কেন্দ্রে আছে মূলত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা। এই সময়ের নকশাল আন্দোলনের প্রভাব তাঁর সাহিত্যকে খুব বেশি পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর কলমে জেগে উঠেছিল মানুষের পক্ষ নিয়ে হাজার এক সওয়াল।

যৌনতার বিষয়টি তাঁর কবিতাতে ব্যাপক হারে থাকলেও, তা নিতান্তই শুধুমাত্র ভোগের বিষয় হয়ে ওঠেনি। তিনি যৌনতার আবেশ দিয়েই কখনও আঘাত করেছেন ধর্মীয় গোঁড়ামিকে, কখনও-বা যৌনতাকে পাশ কাটিয়ে রেখে প্রকাশ করেছেন ভালোবাসার শাশ্বত রূপটিকে। এখানেই তিনি হাংরি গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছতে পেরেছেন সাধারণ মানুষের মনের ঘরে। এবং হাংরিদের থেকে তাঁর এই মৌলিক অমিলের মূল কারণ হয়তো প্রেমিকা নীলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যর্থ প্রেম। সেজন্য কোথাও যেন নিজের মধ্যে নিজেকেই গুমরে গুমরে মেরে ফেলার মুহূর্তেও তিনি বলতে পেরেছিলেন, না, মানুষের সঙ্গে আমার আর বিরোধ নেই কোনও।

মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ১৯৮১-র ৩১ মে তিনি অসুস্থ হয়ে মারা যান। তাঁর বন্ধু কবি সুবিমল বসাক লিখেছিলেন, ...শুরু হয় নিজের মধ্যে খেলা, আইডেনটিটির উন্মোচন, নেশা-গাঁজা ভাঙ। পরবর্তীকালে নেশা করাটা ফাল্গুনীর রক্তে মিশে গেছিল। নিজের 'ইগো' ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য, ইমোশনকে সতেজ করার জন্য, নেশা একান্ত প্রয়োজন, ফাল্গুনী এরূপ বিশ্বাস করত। তাঁর অকালমৃত্যু বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি করে দিয়ে গেছে যা কখনওই ভরাট হওয়ার নয়।

ব্রিটিশের সূর্য

বীথি চট্টোপাধ্যায় (লেখিকা)

কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়র দিশেহারা। যদিও ডালহৌসির এই জায়গাটা গাছপালায় ভরা শীতল, তাছাড়া শরৎকালের বাতাসে মৃদু শীতের স্পর্শ, তবুও তাঁর মহার্ঘ স্যুট কোট ঘামে ভিজে যাচ্ছে। বাহারি টুপি খুলে রাস্তায় পড়ে গিয়েছে। রাস্তার তলা দিয়ে কীভাবে জলের পাইপ যাবে এটা কিছুতেই বাঙালি আর বিহারি মিস্ত্রিদের বোঝাতে পারছেন না ব্রাডফোর্ড লেসসি সাহেব। কারণ ব্রাড বাংলা-হিন্দি প্রায় জানেন না বললেই চলে আর তাঁর অধীনস্থ মিস্ত্রিরা কেউই একবর্ণ ইংরেজি জানেন না। সাহেব হাল ছেড়ে দিলেন। তিনি ফিরে যেতে উদ্যত হলেন নিরুপায়ভাবে। টুপিটা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ঘোড়ায় টানা কৌচে উঠতে যাবেন এমন সময় কেউ একটা তাঁকে পিছন থেকে ডাকল। 'মে আই?' চমকে তাকিয়ে সাহেব দেখলেন মাঝারি গড়নের একটি বাঙালি ছেলে। সাধারণ চেহারা শুধু চোখ দুটি প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত। সাহেব অবাক। কী চায় ছেলেটি... ছেলেটি জানাল তার নাম রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কয়েক বছর আগে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত সে। সাহেব যদি চান তাহলে সে রাস্তার নীচে জলের লাইন কীভাবে যাবে তা এই মিস্ত্রিদের বাংলা বা হিন্দিতে বুঝিয়ে দিতে পারে। কারণ কিছুক্ষণ ধরে সে দেখেছে সাহেব তাঁর ইংরেজি ভাষা কিছুতেই শ্রমিকদের বোঝাতে পারছেন না। সাহেব দেখলেন রাজেন্দ্রনাথ নামে এই ছেলেটির ইংরেজি নিঁখুত, নির্ভুল, স্পষ্ট। সাহেব যাকে বলে হাতে চাঁদ পেলেন যেন। তিনি ইংরেজিতে নির্দেশ বলতে লাগলেন, রাজেন্দ্র সেই ইংরেজির উপযোগী বাংলা অনুবাদে সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিতে লাগল মিস্ত্রিদের। মিস্ত্রিরাও চটপট কাজ বুঝে নিলেন। এত প্রাঞ্জল সহজ রাজেনের মুখের বাংলা যে সে বলামাত্র বুঝতে পারছেন ঠিকে কর্মীরা। সাহেবও অনুভব করছেন যে কাজ নির্ভুল বুঝে নিচ্ছে তাঁর মিস্ত্রিবর্গ। বোঝানো হয়ে যাবার পর সাহেব রাজেনকে তুলে নিলেন নিজের ফিটন গাড়িতে। রাজেনকে তিনি ছাড়তে চান না। ইংরেজি আর ইঞ্জিনিয়ারিং দুটোতেই রাজেনের দারুণ দখল। আবার সহজ করে বাংলা-হিন্দিও বলতে পারে সে। এরকম ছেলেকে একশো পঁচিশ তিরিশ বছর আগে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সাহেব অফিসারদের বড় দরকার হতো। তাঁদের ইংরেজি সাধারণ মানুষকে বাংলা বা অন্য ভারতীয় ভাষায় এরাই বুঝিয়ে দিত। সাধারণ মানুষের কথাও এঁরাই ইংরেজিতে তর্জমা করে বলে দিত সাহেবদের। ফিটন গাড়িতে উঠে সাহেব রাজেনকে নিয়ে আরও জানতে উৎসুক। ইয়োর ব্যাকগ্রাউন্ড? প্রোফেশন? রাজেন জানায়। দূরে বসিরহাটের প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে সে। তাদের গ্রামে একটাও পাকা বাড়ি কেউ কোনওদিন দেখেনি। তার বাবা মারা গিয়েছেন তখন তার বয়স ছয়। অমানুষিক কষ্ট করে তার মা তাকে বড় করেছেন। গ্রামের টোলে লোকে বলত লেখাপড়ায় তার মাথা আছে। বিয়ের পর শ্বশুর মহাশয় তার কলতাতায় থাকা-খাওয়ার খরচ জোগাতেন। আর সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত শহরের বিখ্যাত প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রেসিডেন্সিতে মেধাবী ছাত্র বলে তার নাম হল, কিন্তু রাজেনের ভাগ্য তার সঙ্গে শত্রুতা করে বসল। প্রবল হাঁপানির প্রকোপে ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে পারল না রাজেন। ডিগ্রি না নিয়েই সে ইতি টানল তার ছাত্রজীবনে। ছোটখাটো মেরামতি- কন্ট্রাকটারির কাজ করে সে এখন সংসার চালায়। সাহেব জিজ্ঞেস করলেন রাজেন যা পড়েছে, সে যা ইংরেজি জানে তাতে এই উনিশ শতকের শেষে সে তো সাহেবি কোম্পানিতে চাকরিও নিতে পারত। সাহেব তাকে কলকাতা কর্পোরেশনে বড় চাকরি দিতে চান। তিনি নিজের সচিব করে নিতে চান এই মেধাবী ছেলেটিকে। রাজেন সবিনয়ে জানায় চাকরি করতে তার ভালো লাগে না। সে জীবনটা একটা বাঁধাধরা নিয়মে কাটিয়ে দিতে চায় না। স্বাধীন ব্যবসা করতে চায় সে। ভারতে নতুন নতুন শিল্পবাণিজ্য সে আমদানি করতে চায়।

সাহেব পাইপ ধরালেন। আই সি। তারপর একটু ভেবে বললেন তোমার মতো ইয়ংম্যান বাঙালিদের মধ্যে আমি আগে দেখিনি। এখানে সকলেই একটা কেরানির চাকরি পেলে বর্তে যায়। দশটা-পাঁচটা নিয়মের বাইরে বেরোতে চায় না কেউ। তুমি সেখানে রেয়ার একসেপশন। বেশ, তুমি কনস্ট্রাকশনের কাজ করো। কলকাতা কর্পোরেশন পলতায় একটা বিরাট জলবণ্টন প্রকল্প করবে। তুমি ওটার দায়িত্ব নিতে পারবে? কাজ ভালো হলে তারপর পেমেন্ট। কি রাজি আছো? এক কথায় রাজি হয়ে যায় রাজেন। পলতার জলপ্রকল্প দারুণভাবে সফল হল। রাজেনের কাজের প্যাটার্ন দেখে সাহেবরা ধন্য ধন্য করে। একের পর এক প্রকল্প রাজেনের হাতে আসতে থাকে। সারা ভারতের স্থাপত্য আর মেরামতি শিল্পের বাজারে রাজেন মুখোপাধ্যায়ের নাম শুনলে সাহেব স্থপতিরা এখন ভয় পায়। রাজেনের বুদ্ধি প্রখর, স্থাপত্য বিদ্যায় কী করে যে তাঁর এত অগাধ ব্যুৎপত্তি হল ভেবে পায় না সাহেবকুল। টমাস মার্টিন বলে এক ধনকুবের সাহেবের সঙ্গে পার্টনারশিপে রাজেন্দ্রনাথ সম্প্রতি চালাতে শুরু করেছেন মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি। তাঁর মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি কলকাতার বুকে এক এক করে গড়ে তুলছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বেলুড় মঠ ও মন্দির, টিপু সুলতান মসজিদ। কলকাতা যেন তাঁর হাতে একটু একটু করে সেজে উঠছে। নতুন কলকাতার রূপকার হয়ে উঠছেন রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

এরমধ্যে বাংলার গভর্নর চালস আলফ্রেড এলিয়ট একদিন তাঁর বাড়ির এক নৈশপার্টিতে নিমন্ত্রণ করলেন রাজেন মুখোপাধ্যায়কে। বড়লাটের বাড়ির প্রকাণ্ড ঝাড়লণ্ঠনের নীচে লাল সুরাপাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রাজেন খেয়াল করলেন সেই পার্টিতে তিনি ছাড়া আর কোনও ভারতীয় আমন্ত্রিত নয়। তাঁর স্ত্রী যদুমতি সেখানে একমাত্র শাড়ি পরিহিতা বঙ্গনারী। গ্লাসে গ্লাসে হিল্লোল উঠছে। পিয়ানোয় সুর তুলে শুরু হচ্ছে নাচ। হঠাৎ আরও দুজন বাঙালি পুরুষ আর একজন বাঙালি মহিলা প্রবেশ করলেন সেই পার্টিতে। মহিলাটির বয়েস পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। কিন্তু তাঁর সাজগোজে কোনও বয়স্ক বঙ্গনারী সুলভ সাদামাটাভাব নেই। যদুমতির থেকে অন্তত কুড়ি বছরের বড় হবেন ওই

মহিলাটি। অথচ যদুমতির মতো তিনি মাথায় ঘোমটা দেননি। লাল টুকটুকে একটা ঢাকাই জামদানি পরেছেন সামনে কুচি দিয়ে। টকটকে ফর্সা রং; ঠিক দুর্গা ঠাকুরের মতো দেখতে মহিলাটিকে। বেশি গয়না পরেননি। কানে দুটি বড় বড় হীরকখচিত দুল দূর থেকে দেখা যায়। মহিলাকে একবার দেখলে চোখ ফেরানো যায় না চট করে। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকায় পুরুষটি সম্ভবত মহিলার স্বামী। এই দম্পতির সঙ্গে আবার সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা গায়ে কালো শাল জড়ানো বছর চল্লিশের একটি লোক এসেছেন, তিনি কে? রাজেনের মনে হল চেহারায় যে কোনও গ্রিক স্থাপত্যকে হার মানাতে পারে লোকটি। কিন্তু কী সাধারণ জামাকাপড় পরে রয়েছে! পাজামা পরে কেউ গভর্নরের নৈশভোজে আসে কখনও! লোকটা কি পাগল নাকি? এঁরা কারা? মহিলাটির সাজগোজ দেখে তো মনে হচ্ছে ব্রাহ্মণ। জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথের বাড়ির লোক নাকি এঁরা? বড়লাটের স্ত্রী খুব খাতির করছেন ওঁদের। স্যার রাজেন তাঁর ব্যবসার অংশীদার স্যার টমাস মার্টিনকে জিজ্ঞেস করলেন এঁদের পরিচয়। মার্টিন জানালেন রাজেন্দ্রনাথের অনুমান ঠিক। এঁরা ঠাকুরবাড়ির লোক। ওই স্যুট-টাই পরা বয়স্ক ভদ্রলোক এস এন টেগোর। দ্বারকানাথের এই নাতিটি প্রথম ভারতীয় আইসিএস। তাঁর সঙ্গে রয়েছে তাঁর স্ত্রী আর ছোটভাই। রাজেন্দ্রনাথ পাইপ ধরালেন। ওহ, তিনি এস এন টেগোর! প্রথম ভারতীয় সিভিল সার্ভেন্ট। পরিচয় করতে এগিয়ে গেলেন রাজেন্দ্র। দ্বারকানাথ ঠাকুরকে নিয়ে রাজেন্দ্রনাথের সম্ভ্রম বহুদিন ধরে। একজন বাঙালি উদ্যোগপতি যে সারা দুনিয়ার বাণিজ্যমহলে সাড়া ফেলে দিতে পারেন তা চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করেছেন দ্বারকানাথ। বড়লাট নিজে এগিয়ে এলেন পরিচয় করাতে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বাংলায় বললেন, 'আমি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই আমার স্ত্রী জ্ঞানদান্দিনীদেবী।' মহিলাটি হাতজোড় করে নমস্কার জানালেন। মহিলাটির হাতে শাঁখা পলা নেই। কপালে টিপ নেই। বিবাহিতা মহিলা কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুর নেই। সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, 'আর এ হল আমার ছোটভাই রবি। আমার এই ভাইটি বাংলাভাষার একজন নামকরা কবি কিন্তু।' রাজেন্দ্রনাথ জানতেন ঠাকুরবাড়ির ছেলেপিলেরা শখে লেখালিখি করে। এটা নতুন কোনও ব্যাপার নয়। তবে রবি বলে কোনও কবি বা লেখকের নাম শোনেননি রাজেন্দ্রনাথ। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের পোকা তিনি। মধুসূদনের কাব্য পড়েছেন। এই সুন্দর মতো দেখতে যুবকটি বোধহয় তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়। ঠাকুরবাড়িতে যেমন অতি মেধাবী সন্তান রয়েছে। তেমন বাপ-দাদার পয়সা ওড়ানো আধ পাগল ছেলেপিলের সংখ্যাও কম নয়। এই রবি বলে ছেলেটিও নিশ্চয় ঠাকুরবাড়ির কোনও খামখেয়ালি সন্তান। না হলে বড়লাটের ডাকা পার্টিতে কেউ পাজামা পরে আসে! হাউ আ ফুল! রাজেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবলেন। তবে ভদ্রতা বশে হাত বাড়িয়ে দিলেন রবির দিকে। আই অ্যাম রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি। নাইস টু মিট ইউ মিস্টার টেগোর। রবি রাজেন্দ্রনাথের হাতটি ধরে বলল। আমি রবীন্দ্রনাথ। ইমারতি শিল্পে আপনার কীর্তির কথা আমার মতো সাধারণ মানুষের কানেও এসে পৌছিয়েছে। আমি প্রায়ই যশোরে শিলাইদহে বাবামশায়ের জমিদারির কাজ দেখাশোনা করি। আপনি শিলাইদহে আসুন না, শুধু শহরের উন্নতি করলেই দেশ এগোবে না কোনওদিন। গ্রাম যতদিন পিছিয়ে থাকবে দেশও পিছিয়ে থাকবে। শিলাইদহে থাকলে আপনি বুঝবেন গ্রাম আর শহরে কত লক্ষ ক্রোশ তফাত। রাজেন্দ্রনাথের তাক লেগে গেল। এই এলোমেলো পোশাকের মানুষটিকে তিনি ঠাকুরবাড়ির আধপাগল খেয়ালি সন্তান ভাবছিলেন! কিন্তু কী দামি কথা বললেন ভদ্রলোক। ব্রিটিশ সরকার শুধু ভারতের শহরগুলিকেই সাজাচ্ছে। গ্রামগুলি পড়ে থাকছে মধ্যযুগের অন্ধকারে। এর ফলে কোনও সমান্তরাল গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে উঠছে না দেশে।

বাকি পার্টিতে যেন কোনও জরুরি চিন্তায় ডুবে রইলেন রাজেন্দ্রনাথ। ফেরবার সময় গাড়িতে তাঁর স্ত্রী যদুমতিকে তিনি বললেন। 'সাহেবদের পার্টিতে তুমি এরপর থেকে আর মাথায় ঘোমটা ঢেকে যেও না। হাতে শাঁখা পলা এসবই-বা পরবার দরকার কী? হাতে এবার থেকে শুধু হিরের চুড়ি পরেই বেরিও।' যদুমতি রাজেন্দ্রনাথের ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী। পড়াশোনা শিখেছেন নিজে নিজে। যদুমতি হেসে বললেন, 'আজ পার্টিতে টেগোরদের দেখে তুমি বুঝি খুব ইমপ্রেসড? ওদের ফ্যামিলিটা কিন্তু ভয়ানক। অনেক স্ক্যান্ডাল আছে ওদের। তবে রবিবাবু লেখেন খুব ভালো। 'বউঠাকুরাণীর হাট' বলে যা একটা নভেল লিখেছিলেন, ওয়ানডারফুল।' *এরপর আটের পাতায়*

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৯ মে ২০১৭

আমার চোখে কলকাতা

(প্রথম পাতার পর)

তবে সেই কলকাতাকে আমি খুঁজে পেলাম না। আমি যখন বিদেশে যাই লোককে বলি আমি কলকাতা থেকে এসেছি লোকে চেনে না, ভ্রু কোঁচকায়। আবার আমি যদি বলি কালোকুত্তা তাহলে ঠিক বুঝতে পারে। এবং এভাবেই অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে তারা কলকাতাকে কালোকুত্তার দেশ বানিয়ে ফেলেছে। অথচ আমাদের শহরেই আজও বেইমান ইংরেজ সাহেব অক্টারলুনির স্বাক্ষর বয়ে চলেছে অক্টারলুনি মনুমেন্ট।

অনেক কিছু বদলে যাচ্ছে শহরটার। একসময় ওরিয়েন্টাল মার্কেট বলে একটা মার্কেট ছিল নিউ মার্কেটের হগ মার্কেটের ভিতরে। যেখানে যাওয়াটা ছোটবেলায় আমাদের কাছে একটা ইভেন্ট ছিল। অনেক কিছুই এখন আর নেই। তবুও এখনও যখন কলকাতার গলিতে হাঁটি কখনও কখনও পুরনো কলকাতার গন্ধ পাই।

আসলে কলকাতা সবসময়ই এক। অস্থির কলকাতা সবসময়ই অস্থির। যে পতাকার নীচেই থাকুক না কেন, অস্থিরতা থাকবেই। যদি নিমেষে বদলে ফেলা যেত কলকাতাটাকে তাহলে সবার আগে 'কালকুট্টা' বা 'কালোকুত্তা'কে 'কলকাতা' বানাতাম। একদম বিশুদ্ধ কলকাতা। যদিও আমার চাওয়াতেই কিছু এসে যায় না তবুও আমি চাই আদিগঙ্গাকে সংস্কার করা হোক তার দু'পাশের বাড়িগুলোকেও সংস্কার করা হোক। ফিরে আসুক সিটি অব প্যালেসের জৌলুস।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ২৯ মে ২০১৭

লং লিভ কলকাতা: তিলোত্তমার স্মৃতি-পাতা জুড়ে হারানো খেলার মেলা

অন্বেষা রায়চৌধুরী

কলকাতা। এমন একটা শহর যেখানে অতীত থমকে আছে। দেওয়ালে জমে আছে পলেস্তারার মতো। অথবা জানালার শার্সিতে নিজের ছায়া রেখে গিয়েছে। এই শহরের ইতিহাসের সঙ্গেই মিশে আছে বহু খেলার স্মৃতি। 'আহ্লাদে আটখানা/সাতে পাঁচে নেই/ মাঝখানে যেইজন/পথ পাবে সেই...!' শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে কিতকিতের এই ছকই ভূতনাথকে পাতালঘরে প্রবেশের আশ্চর্য উপায় শিখিয়ে দিয়েছিল। আপাতভাবে 'কিতকিত' কিন্তু অট্টালিকার ঘরের খেলা হতে পারেনি। ছবির দৃশ্যে তাই শীতেমোড়া গ্রামের বালিকাদের কিতকিতের ছকটাই উঁকি দেয়। কিন্তু এখনকার কলকাতার স্মৃতিতে কিতকিতের মতো আরও বড় চেনা খেলার দৃশ্যগুলোও কেমন আবছা হয়ে যাচ্ছে। বড়দিনের ছুটিতে পাড়া উজিয়ে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা হোক বা গলি ক্রিকেট-ফুটবলের কম্পিটিশন— সবকিছু নিয়েই ছিল এই শহর। কবাডির হুল্লোড়, খো-খো, হা-ডু-ডু, পিট্টুর হার-জিতের আনন্দ-বেদনা ছিল এই শহরজুড়ে! কিন্তু এখন এই খেলাধুলোই হারিয়ে গিয়েছে শহর থেকে।

তারা কোথায় গেল? উত্তর কলকাতার বাসিন্দা বছর সত্তরের সুবিমল সরকার, পেশায় ছিলেন সরকারি কর্মচারী। তিনি বলছিলেন, 'সবকিছুই বোধহয় হারিয়ে গিয়েছে বিস্মৃতির অতলে। আমাদের সময়ে পাড়ার অলিগলিতে কাটা থাকত কিতকিতের ছক। মাঠে কোথাও কবাডি, হা-ডু-ডু নিয়ে গলার শিরা ফুলিয়ে, পেশির জোর নিয়ে তৈরি দুই দল। এখনকার ছেলেমেয়েরা হয়তো এইসব খেলার নামই শোনেনি।' শুধু কিতকিতই-বা কেন? পুরনো খেলার মধ্যে পিট্টুই-বা কম কী ছিল? সাত ঘুঁটি সাজিয়ে, ৩ টাকার প্লাস্টিক বল মেরে দে ছুট দৌড়ের সেই খেলা এখন নেহাতই অলীক মনে হয়। অথচ আগে শহরের পাড়ায় পাড়ায় চলত পিট্টু কম্পিটিশন। এ খেলায় আবার হার-জিৎ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। বরং কাকে কে কতবার মারতে পারল, তারই প্রতিযোগিতা। খোল দিয়ে ছক কেটে এই পিট্টু, কবাডি, কানামাছি, কিতকিতের কম্পিটিশনই ছিল তখন আমাদের লাইফলাইন। আবার দক্ষিণ কলকাতার পুরনো বাসিন্দা সনাতন ভট্টাচার্য বলছিলেন, 'দক্ষিণের পাড়াগুলিতে কবাডি বা কিতকিতের চেয়ে ক্রিকেট বা ব্যাডমিন্টন বেশি জনপ্রিয় ছিল। অনেক গলিতেই দেখা যেত ব্যাডমিন্টনের বারোয়ারি নেট। গলিতে গরমকালে ফুটবল আর শীতকালে ক্রিকেটের রমরমা।' তারপর ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে যেতে থাকা এই শহরটির খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও নিজেকে বদলে নিল।

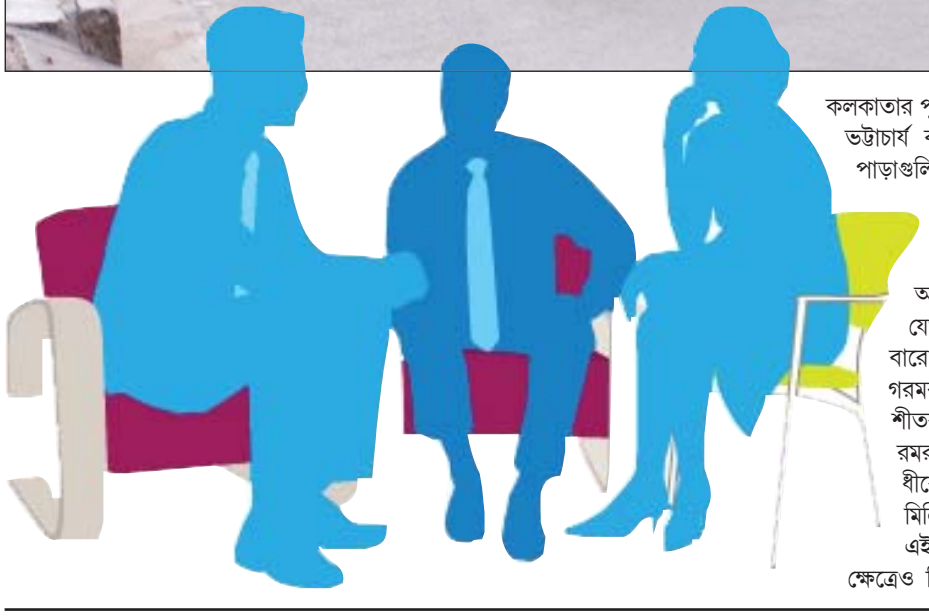

অ্যাপার্টমেন্টের কম্পাউন্ডে কিতকিত কখনও খেলা হয়নি। তবে এক সময় ব্যাডমিন্টন আমরা খুব খেলতাম। এখন সেটাও হয় না। আসলে আমাদের প্লেজার টাইমটা খুব শর্ট। তাই পার্টি বা নাইট আউটিংটাই বেশি ইন। নাইট ড্রাইভিং-এ যত মজা, বিকেলে কম্পাউন্ডের নীচে ব্যাডমিন্টনে সেই মজা নেই। বাবা-মায়েরা ছোটবেলায় এটাই মজা মনে করতেন। কিন্তু এখন সময় পালটেছে। তাই তার সঙ্গে নিজেদেরও পালটাতে হবে।' বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার এক বহুতল আবাসনের বাসিন্দা পুষ্পল দত্ত বলেন, 'কলকাতায় বস্তির ধারণা তৈরি হবার আগে থেকেই আমরা কিতকিত খেলে বড় হয়েছি। ছোটবেলায় দিদির সঙ্গে কিতকিত খেলে অনেক শীত-বসন্ত কাটিয়েছি। এখনও শীত মানে আমার কাছে পার্টি নয়, পুরনো অলি-গলি একইরকম থেকে গেলেও খেলাগুলো ঠাঁই পেল স্মৃতিকোঠায়।

প্রশ্ন ওঠে, কেন হারিয়ে গেল এই খেলাগুলি? মধ্যবয়সী ব্যাংককর্মী সৌমী দাশগুপ্ত কিন্তু এর জন্য দায়ী করছেন এই শহরটিকেই। তাঁর কথায়, 'এই শহর যেমন খেলার জায়গাটুকু কেড়ে নিয়ে ঝলমলে হাইরাইজে সাজতে ব্যস্ত, তেমনই শহরের বাসিন্দারাও সেই তালে তাল মিলিয়ে ভুলে গেছে অতীত মাহাত্ম্য। বিনোদন যেমন ঠাঁই করে নিয়েছে ড্রয়িংরুমে, তেমনই খেলাধুলোও সেঁধিয়ে ঘিয়েছে ঘরের চার দেওয়ালে। এই প্রজন্মের কাছে খেলা মানে অনেকটাই ভিডিও-গেম! আর এর জন্য আমরা বাবা-মায়েরাও অনেকাংশে দায়ী। আমরাই ছেলেমেয়েদের বাইরে বেরোতে দিই না। তাই আমরা যা পেয়েছিলাম, ছেলেমেয়েরা আর তা পায় না।'

অবশ্য উলটো মতও আছে। শহরের নামী ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্রী প্রিয়াংকা সরকার যেমন এইসব 'বোগাস' খেলা নিয়ে মোটেই আগ্রহী নয়। তাঁর কথায়, 'কিতকিত ভীষণ বস্তি টাইপ খেলা। ওটা নিয়ে বলতে পারব না। আমাদের ছোটবেলার মিষ্টি দিনগুলো।' বুড়ি ছোঁওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলেও এখন অনেকে চোখ কপালে তুলবেন। বুড়ি বানিয়ে তার চারপাশে ঘুরে নিজের নম্বর কুড়িয়ে খেলার নাম ছিল বুড়ি ছোঁওয়া। আর প্রেমের খেলার আর এক নাম কুমির ডাঙা। না ছুঁতে পারা মানুষটাকে কুমির ডাঙার ছকে একটু ছুঁয়েই আবার স্থলে উঠে গেলে কুমির ডাঙা শেষ হয়। লং ড্রাইভের মহিমায় কোথায় আছে এই কুমিরডাঙার রোম্যান্টিসিজম? কোথায়ই-বা বন্ধুরা মিলে পরস্পরকে জড়িয়ে ধুলোর মাঝে কবাডি? তবে এখনকার ছেলেমেয়েদের দোষ দেব না। ওরা খেলার সুযোগ পায় না। ফলে খেলাধুলা নিয়ে আলাদা করে প্যাশন জন্মাবে না, এ তো বলাই বাহুল্য।

আবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া সুতীর্থ চক্রবর্তীর মনে এখনও তাজা ছোটবেলার স্মৃতি। মধ্য কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা সুতীর্থ বলছিলেন, 'আগে তো বটেই, এখনও মাঝে মাঝে গলিতে দাপিয়ে ক্রিকেট, ফুটবল খেলা হয়। বাসিন্দাদের আপত্তি থাকে। বকাঝকা থাকে। তাতে 'কুছ পরোয়া নেহি'। তাই বল কারওর বাড়ির কাচ ভাঙলে বা কারওর টব উলটে দিলে যে হুংকার উড়ে আসে, তাতে কান দিই না।' তবে এখন পাড়ার অনেকেই বাইরে চলে যাওয়ায় সেভাবে খেলা হয় না। আগে যখন খেলা হতো, তার মাঝে আচমকা ব্রেক মানে পাড়ার কোনও সুন্দরী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। ফচকে কেউ কেউ বলত, 'ওরে, খেলা থামা রে! উনি যাবেন।' মেয়েটি হন হন করে মাথা নিচু করে হেঁটে চলে যেত। আবার অনেক সময় খেলা থামত না। কেউ বলে বসত, যেতে হলে খেলার মধ্যে দিয়ে যাও, এখন ম্যাচ থামানো হবে না। গলি ক্রিকেটের স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত সন্দীপ গঙ্গোপাধ্যায় বলছিলেন, 'ছোটবেলায় গলি ক্রিকেটে লোকজন যখন ফুলহ্যান্ড বল করত, তখন অবাক হয়ে দেখতাম আর ভাবতাম, ওয়াসিম আক্রম বা কোর্টনি ওয়ালস কি এর থেকেও জোরে বল করে? অসম্ভব টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ হতো। সেখানে কোথায় লাগে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান। আর এই খেলার নিয়ম আসল ক্রিকেটের থেকেও শক্ত!' নন্দা মাসিদের বাড়ির জানলায় না পাঠালে ছয় হবে না। ছাদের ওপর উঠে গেলে আউট! ইঁটের উইকেটে ব্যাট ঠেকে গেলে আউট। যার ব্যাট সে দু'ওভার বেশি খেলবে। আরও একটা নিয়ম ছিল। 'ওয়ান ওয়াল ক্যাচ' নামে একটা আউট। অর্থাৎ একটা বল যদি দেওয়ালে লেগে ফিল্ডারের হাতে আসে সে আউট। আমাদের পাড়ায় প্রতি রবিবার সকালগুলোতে গলি ক্রিকেটের উন্মাদনা ক্যারিবিয়ান বিচ ক্রিকেট বা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটকেও হার মানাতে পারত। তবে দিনে ক্রিকেট চললেও সন্ধের পর গলির মোড়ে বসত তাসের আড্ডা। সঙ্গে ক্যারাম। ধীরে ধীরে কলকাতা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এই সমস্ত খেলা। এর মাঝে এখনও যাঁরা গলির মধ্যে থেকে অকারণের 'ছয়' চিৎকার শোনেন, তাঁরাও মনে হয় আর বেশিদিন সেই আওয়াজ শুনতে পাবেন না। এরপর একদিন হয়তো বইয়ের পাতাতেই মিলবে এই শহরের পুরনো খেলার কথা।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৯ মে ২০১৭

লাইব্রেরি কালচার

কৃষ্ণগোপাল রায়

১৮৩৫-এর ফেব্রুয়ারিতে টমাস ব্যবিংটন মেকলে তাঁর মিনিট-এ সেই চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেছিলেন যে সারা ভারতের সমস্ত সাহিত্যগ্রন্থের মূল্য ইউরোপের একটা ভালো লাইব্রেরির এক তাক বইয়ের সমানও নয়। এমন মন্তব্য করার সময় তিনি চালাকি করে এ-ও বলেছিলেন মহাদেশীয় বিদ্যাবিশারদরাও এই সত্য অস্বীকার করতে পারেনি। যে প্রসঙ্গে এইসব কথা তিনি বলেছিলেন আসলে সেটা ছিল ইংরেজিকে সরকারের শিক্ষামাধ্যম হিসাবে বলবৎ করা। বস্তুত এই বছর থেকেই 'ইংলিশ এডুকেশন অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে তা করা হয়েছিল। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৩৬-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের প্রথম পাবলিক লাইব্রেরি, 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি'।

পণ্ডিতদের কাছে অথবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিছু পুঁথিপত্র নিশ্চয় ছিল, কিন্তু লাইব্রেরি বলতে যা বোঝায় তার রূপদান ইংরেজদের কাছেই আমাদের পাওয়া। পাবলিক লাইব্রেরি হিসাবে প্রথম লাইব্রেরিটি ১৮৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও লাইব্রেরি অবশ্য এর আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ; এর লাইব্রেরিটি ছিল উল্লেখ করার মতো। দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশ থেকে হাতে লেখা অজস্র পুঁথি সংগৃহীত ছিল এই লাইব্রেরিতে। পরে এইসব পুঁথির কিছু কিছু মুদ্রণও করানো হয়েছিল। এই কলেজের অধ্যাপকদের দিয়ে লেখানো হয়েছিল নানা গ্রন্থ; সেগুলোও মুদ্রিত হয়েছিল। মুদ্রণের কাজ প্রথমদিকে করত শ্রীরামপুর মিশন। এখানে ১৮০১-এ প্রথম প্রেস বা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যেখানে সমকালীন ভারতের পঁচিশটি ভাষায় ম্যাথুর বাইবেল মুদ্রণ ছাড়াও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের রচনা এবং সংগৃহীত পুঁথিও মুদ্রিত করা হয়েছিল। শ্রীরামপুর মিশনারিদের উদ্দেশ্য ছিল মূলত ধর্ম বিস্তার; সেইজন্য তারা মূলত ধর্মীয় পুঁথিপত্র সংগ্রহ, মুদ্রণ ও প্রচার করতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এমন কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। তাই এ-কলেজের লাইব্রেরিতে ছিল সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, নক্ষত্রবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ের বই। ১৮০৭-এ ইংল্যান্ডে হেইলেবুরি (Haileybury)-তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় কর্মচারীদের শিক্ষাদানের উদ্দেশে এবং তখন থেকেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কদর কমতে থাকে। সিপাহি বিদ্রোহের পর কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার আগেই লর্ড মেটকাফ ১৮৩৬-'৩৭-এ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ৪৬৭৫টি বই দান করে দেন ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিকে। যদিও এই লাইব্রেরিটি সরকারি ছিল না, ছিল স্বত্বাধিকারভিত্তিক। একেবারে বা তিনবারে ৩০০ টাকা দিলেই স্বত্বাধিকার পাওয়া যেত। প্রথম স্বত্বাধিকারী ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। বাংলা এবং উত্তর-পশ্চিম সরকার নিয়মিত এই লাইব্রেরিতে অর্থদান করত। ব্যক্তিগতভাবেই বই ও অর্থদান করা যেত। এর লক্ষ্য ছিল, জনসাধারণের জ্ঞানোন্নতি। সাধারণ পাঠক এবং ছাত্ররা এখানে বিনা পয়সায় নির্দিষ্টকাল অবধি পড়াশোনা করার সুযোগ পেত।

সরকারি সচিবালয়ে কয়েকটি বিভাগীয় লাইব্রেরি একসঙ্গে মিলিয়ে ১৮৯১-এ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি'। এখানেও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এবং লন্ডনের ইস্ট ইন্ডিয়া বোর্ডের অনেক বই প্রদান করা হয়েছিল। তবে এ-লাইব্রেরিতে কেবলমাত্র কোম্পানির অফিসারদেরই পড়বার সুযোগ ছিল। লর্ড কার্জন দেখলেন 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি' এবং 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি' উভয়কে একসঙ্গে মিলিয়ে দিলে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব হবে, যা পাঠককে পড়াশোনার যোগ্য পরিবেশ এবং আরও অধিক পরিমাণ বইপত্র পাওয়ার সুযোগ দিতে পারবে। ১৯০৩-এ তিনি উভয় গ্রন্থাগারকে মিলিয়ে বিখ্যাত মেটকাফ হলে স্থানান্তরিত করলেন। এই মেটকাফ হল আগে গভর্নর জেনারেলদের আবাস ছিল। লাইব্রেরির নাম থাকল 'ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি'। গেজেটের জন্য যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল; তাতে এই লাইব্রেরিকে ছাত্র তথা সর্বসাধারণের এবং ভবিষ্যতের ভারত-গবেষকদের ব্যবহারযোগ্য বলা হয়েছিল। সেইজন্য ভারত-বিষয়ক সমস্ত গ্রন্থ এবং লেখালিখি সংগ্রহ করার ওপর জোরও দেওয়া হয়েছিল। লাইব্রেরিটিকে সুব্যবস্থিত করার জন্য লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সহকারী গ্রন্থাগারিক জন ম্যাকফারলেনকে এর গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হয়। তাঁর পরে দায়িত্ব নেন বহুভাষাবিদ হরিনাথ দে।

দেশ স্বাধীন হবার পর এই ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিকে 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি' ঘোষণা করা হয়। 'ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি অ্যাক্ট', ১৯৪৮ দ্বারা এবং ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অব কালচারের নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে আলিপুরে বেলেভেডের এস্টেটে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৫৩-তে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী এই জাতীয় গ্রন্থাগার জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।

দেশাত্মবোধের হাওয়ায় ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি এক নতুন ভাবনা জাগিয়ে দিয়েছিল। জাতিকে সমৃদ্ধ হতে হবে। আর সমৃদ্ধ হতে গেলে চাই জ্ঞান। মেধাশক্তিই শক্তিশালী করে জাতিকে। স্কুল-কলেজের এই সময় যেসব বই পড়ানো হচ্ছিল, তাতে মেধার বিকাশ হলেও জ্ঞানের পরিসর ছিল সীমিত। বিদেশি শাসক নিজেদের প্রতি মুগ্ধতা জাগানোর মতো পাঠক্রম তো তৈরি করতই, আর তাদের উদ্দেশও ছিল জ্ঞানী নয়, কেরানি তৈরি করা। গ্রন্থাগার এই অবরোধ-মুক্তির চাবি হাতে তুলে দিতে পারে। এই বোধ নব্যশিক্ষিত বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করল। অনেকেই নিজেদের সাধ্যে ব্যক্তিগত লাইব্রেরি তৈরি করল। যারা তা পারল না তারা বন্ধুর কাছে চেয়ে বই পড়তে শুরু করল। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একদশী'তে দেখা যাচ্ছে ধনী অটল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' কিনেছে, নিমচাঁদ সেই বই চাইছে পড়বার জন্য। মাইকেলের চিঠিতেও বন্ধুদের সঙ্গে বই দেওয়া-নেওয়ার উল্লেখ আছে। আদান-প্রদানের মাধ্যমে বই পড়ার রীতি গড়ে ওঠে এই সময় থেকেই। বই নিয়ে ভুলে ভুলে যাওয়া বা ফেরত না-দেওয়ার ঘটনার শুরুও সম্ভবত এই সময় থেকেই; এবং বিখ্যাত সেই প্রবাদটির জন্মও এ সময় থেকেই— 'বই আর বউকে বাড়ির বাইরে যেতে দিতে নেই, একবার বাইরে গেলে আর ফেরত পাওয়া যায় না'। বাঙালির এক আত্মম্ভরিতার শুরুও এ সময়। যাঁরা বই পড়ত তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ব্যক্তিগত সংগ্রহ থাকত। ইংরেজের যাপনিকতা থেকেও এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকবে তারা। কোনও ভদ্র ইংরেজের বৈঠকখানার গ্রন্থের র‍্যাকে ছাড়া পূর্ণতা পেত না। অনেকেরই পড়ার জন্য থাকত পৃথক 'স্টাডি' কক্ষ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত জমিদারদের মধ্যে যারা শিক্ষিত, তাদের প্রায় প্রত্যেকে স্বতন্ত্র লাইব্রেরি, নিদেনপক্ষে 'স্টাডি' বানাত। লেখাপড়ায় যাদের আদতে আগ্রহ নেই তারাও আভিজাত্য দেখানোর জন্য বই সংগ্রহ করে রাখত। সমাজের সাধারণ স্তরেও ছিল এই প্রবণতা। পড়াশোনায় আদৌ আগ্রহ নেই কিন্তু লোকের কাছে জ্ঞান-গরিমা দেখানোর জন্য সুদৃশ্য আলমারিতে বই কিনে সাজিয়ে রাখত এরা। 'সধবার একদশী'তে নিমচাঁদ ছড়া কেটেছে, 'আনাড়ির ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে,/ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে।' লিখুন দীনবন্ধু, এ ছড়া ওই কালের সৃষ্টি। অটল বলে সে 'মেঘনাদবধ কাব্য' কিনেছে, 'নিমচাঁদ বলে আমি পড়ব;' 'অটল বলে তার ভালো বোধ হয় না'; তাতেই ক্ষেপে গিয়ে নিমচাঁদ বলছে— 'তুমি পড়েচ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে দশরথি, তোমার ঠাকুরদা পড়েছে কাশীদাস! তোমার হাতে মেঘনাদ, কাটুরের হাতে মানিক।' 'সধবার একাদশী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৬ তে। তার বহু আগেই বই জ্ঞান-গরিমার প্রতীক হিসাবে মান্যতা পেয়েছে। আর, কেবল ব্রাহ্মণরাই পড়াশোনা করবে এই ধারণাটিও অবশিষ্ট ছিল না। কার্যত বামুন-বৈদ্য-কায়েতরাই এগিয়ে থাকলেও অন্যান্য বর্ণ এবং মুসলমানরাও পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটু একটু এগিয়ে আসছিল এ সময়। স্বভাবতই সকলেরই ইচ্ছামতো বই কিনে পড়ার সামর্থ্য ছিল না, তাছাড়া কলকাতার ক্রমবিস্তার এবং জনস্ফীতির জন্যও মেটকাফ হলের লাইব্রেরি অপ্রতুল হয়ে পড়ল। এই প্রয়োজনবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশগড়ার প্রবণতা, যার একটি পন্থা মনে করা হয়েছিল সাধারণ পাঠাগার স্থাপন।

এমনই এক উদ্যোগ খুব সামান্য উপকরণ নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল 'চৈতন্য লাইব্রেরি'(১৮৮৯ খ্রি.)। প্রথমে এর নাম ছিল 'চৈতন্য লাইব্রেরি অ্যান্ড বিডন স্কোয়ার লিটেরারি ক্লাব'। এর আগে অবশ্য 'বড়বাজার ফ্যামিলি লিটেরারি ক্লাব' (১৮৫৭ খ্রি.), 'মহমেডান লিটারেচর সোসাইটি' (১৮৬৩ খ্রি.), 'হিন্দু লিটেরারি সোসাইটি'(১৮৭৬ খ্রি.), 'বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি'(১৮৮৩ খ্রি.) স্থাপিত হয়েছিল। 'বড়বাজার ফ্যামিলি লিটেরারি ক্লাব' সম্ভবত বিশেষ বিস্তার পায়নি, নবাব আবদুল লতিফ প্রতিষ্ঠিত 'মহমেডান লিটারেচর সোসাইটি' বাংলা, মহীশূর, ভোপাল, অসম প্রভৃতি স্থানের নবাব-প্রিন্সদের নিয়ে পরিচালিত হওয়ায় এবং এর কাজকর্ম উর্দু-আরবি-পারসি অথবা ইংরেজি ভাষায় হওয়ায় বাঙালি মুসলমানদের খুব একটা লাভ হয়নি। তবে আধুনিক বিশ্বের নানা বিদ্যায় এবং বিজ্ঞানচর্চার দিকে মুখ ঘোরাতে এই সংস্থার ভূমিকা ছিল। মূলত এদের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩০ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল এই সংস্থা। বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি-ই বোধ হয় চৈতন্য লাইব্রেরির পূর্বে একমাত্র লাইব্রেরি যা রাজা-নবাব বা সরকার বাহাদুরের বদান্যতা ছাড়াই সাধারণ মানুষের উদ্যোগে সাধারণ মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

'চৈতন্য লাইব্রেরি'র মহিমা বৃদ্ধি হয়েছিল প্রধানত রবীন্দ্রনাথের জন্য। তিনি প্রায়ই এখানে আসতেন। দ্বিতল ভবনের এই লাইব্রেরির নীচের তলায় মাঝে মাঝেই সাহিত্যসভা, প্রবন্ধপাঠের আসর বা অন্যান্য বিষয়ে বক্তৃতার আয়োজন করা হত। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও এখানে আসতেন বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ দিকপাল। এখানে এমন সভাও হয়েছে যেখানে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতিত্ব করছেন আর যুবক রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মারা যাওয়ায় (৮ এপ্রিল, ১৮৯৪) তিন সপ্তাহ পর তাঁকে নিয়ে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছিল এই লাইব্রেরিতে। সেই সভায় নবীনচন্দ্রকে সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ করা হলে তিনি তা অস্বীকার করেন। সে দায়িত্ব পালন করেন ড. গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা দারুণভাবে

জনচিত্ত মোহিত করেছিল। নবীনচন্দ্র না আসার জন্য উদ্যোক্তারা সকলেই খুব আহত হন। নবীনচন্দ্র জানিয়েছিলেন সভা করে শোকজ্ঞাপন করা প্রাশ্চাত্যের কালচার, ভারতীয় কালচার নয়। রবীন্দ্রনাথ পরে 'সাধনা' পত্রিকায় 'শোকসভা' নামক প্রবন্ধ লিখে এ ধরনের স্মরণসভার উপযোগিতা প্রতিপন্ন করেন। এই ঘটনা সে সময়ে কিছুদিন লাইব্রেরিকে কিছুদিন আলোচনার শীর্ষে নিয়ে যায়। এমনিতে এই লাইব্রেরি সাধারণ মধ্যবিত্ত পাঠকদের নিত্য নিয়মিত সমাগমে অতুলনীয় ছিল। দু' আনা মাসিক চাঁদা নেওয়া হতো, দশ টাকা দিলে হওয়া যেত আজীবন সদস্য। এই লাইব্রেরি থেকেই প্রকাশ করা হয়েছিল 'বঙ্গবাসী' ও 'সঞ্জিবনী' পত্রিকা, আর ইংরেজি দৈনিক 'ইন্ডিয়ান মিরর'। লাইব্রেরিটি শুরু করেছিলেন বিডন স্ট্রিটের দুই তরুণ— গৌরহরি সেন ও তাঁর বন্ধু কুঞ্জবিহারী দত্ত। কুঞ্জবিহারীর ঠাকুরদা গঙ্গানারায়ণ দত্ত তাঁদের কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন এবং একটি ঘর ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। সামান্য কিছু ইংরেজি-বাংলা বই এবং একটা আলমারি নিয়ে শুরু হয়েছিল লাইব্রেরির পথচলা।

কলকাতায় লাইব্রেরির সংখ্যা একশোরও বেশি। এর মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটি, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি, আমেরিকান সেন্টার, শ্রীঅরবিন্দ ভবন লাইব্রেরি/চিলড্রেনস লাইব্রেরি প্রভৃতির মতো যেগুলো সরাসরি সরকার বা বৃহৎ-সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত; সেগুলিকে বাদ দিলে অধিকাংশ লাইব্রেরিই স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ও সমাজপ্রেমী যুবকদের সামান্য সঞ্চিত অর্থ। বই এবং এলাকার মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত চাঁদা মূলধন করেই প্রতিষ্ঠিত।

এরপর সাতের পাতায়

বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য জানতে

ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড (২৩৫৯১৯১৫, ২৩৩৭১১৫০)

সিইএসসি গ্রাহক পরিষেবা (২৪৭৮৪৩০২, ২৪৭৮৪৮৮৮, ২৪৭৮৪৮৮৯)

অভিযোগ:

সিইএসসি (উত্তর) ২২৩৭৩১৬১, ২২৩৭৬৪

সিইএসসি (দক্ষিণ) ২৪৬৬৪৬৪৩, ২৪৬৬৩১৬১, ২৪৬৬৩১৬২

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ২৯ মে ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
ক ল কা তা
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল**

জগন্নাথ, পাথুরিয়া ও প্রসন্নকুমার ঘাট

নীহারিকা

পর্ব : পাঁচ

দক্ষিণ বন্দর এলাকার গার্ডেনরিচ থেকে হুগলি নদীর তীরবর্তী ঘাটগুলি সম্পর্কে জানতে শুরু করেছিলাম। জানার তো কোনও শেষ নেই, তাই চলারও কোনও শেষ নেই। অন্য চলার সঙ্গে এ চলার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। গঙ্গার ঠান্ডা হাওয়া খেতে খেতে মনোরম পরিবেশের ভিতর দিয়ে হাঁটার আনন্দই আলাদা। তবে সব জায়গারই এক অবস্থা এমন নয়। মল্লিকঘাটের ফুল বাজার ছেড়ে হাওড়া ব্রিজের তলা দিয়ে নাকবরাবর পোস্তায় ঢুকলে প্রথমেই পড়বে জগন্নাথ ঘাট। এই ঘাট তৈরি হয়েছিল ১৭৫৮ সালে।

নতুন ফোর্ট উইলিয়াম যখন নির্মিত হয় সেই সময় বড়বাজারের ধর্মপ্রাণ বাসিন্দা শোভারাম বসাক এই ঘাট তৈরি করেন। এক সময় নাকি ঘাটের কাছেই জগন্নাথ দেবের মন্দির ছিল। বর্তমানে অবশ্য সেই দেবালয়ের কোনও চিহ্ন চোখে পড়ল না। অতীতে ঘাটের পোশাকি নাম ছিল শোভারাম বসাক স্নানের ঘাট। হুগলি নদী সংলগ্ন এলাকার প্রাচীন মানচিত্রে জগন্নাথ ঘাটের ছবি পাওয়া যায়। পুরনো এই ঘাটের আরেকটি নাম হল ছোটুলাল ঘাট। ঘাটটি এক সময় কলকাতার ব্যস্ততম ঘাট হিসাবে পরিচিত ছিল। এখান থেকে নদীপথে যাত্রীরা পাড়ি দিতেন রাজমহল, ভাগলপুর, মুঙ্গের, দিনপুর, গাজীপুর প্রভৃতি জায়গায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ঘাটের গুরুত্ব ছিল অপরীসীম। এখনও প্রতিদিন এই এলাকা জেগে ওঠে ভোররাত থেকে। সারাদিন নানা হাঁক-ডাক, মহাজনী নৌকায় মাল তোলা ও নামানো, স্নান, পূজার্চনা ইত্যাদি নিয়েই সরগরম হয়ে থাকে জগন্নাথ ঘাট। ঘাটের স্থাপত্যে ঔপনিবেশিকতার ছাপ আজও স্পষ্ট। দুপুরে খালাসি সহ অনেক মানুষই ছাওনির তলায় বিশ্রাম নেন।

কিছুটা দূরেই পাথুরিয়া ঘাট। রোদে ঘামতে ঘামতে হাঁটা দিই তার উদ্দেশ্যে। আনুমানিক ১৮৮৪ সালে এই ঘাটের পত্তন। কিন্তু এই ঘাট সম্পর্কে বা তার ইতিহাসের বিষয়ে অনেক মতান্তর আছে। পাথর শব্দটির অর্থ সকলেরই জানা আর পাথুরিয়া কথাটির হিন্দি অর্থ হল বারবণিতা। স্থানীয় কিছু মানুষের ধারণা গঙ্গা সংলগ্ন এই ঘাটটি একসময় শুধুমাত্র শহরের এক বিশেষ অঞ্চলের পতিতারাই ব্যবহার করতেন। পুণ্যসলিলা ভাগীরথী যখন পতিতোদ্ধারিণীর ভূমিকা পালন করেন, তখন গঙ্গার ঘাটে সমাজচ্যুত শ্রেণির মহিলাদের আসা-যাওয়া স্বাভাবিক।

এই ঘাট ধরে আরও কিছুটা উত্তরে এগিয়ে গেলে পড়বে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ঘাট। এরই অন্য নাম আদ্যশ্রাদ্ধ ঘাট। এস পি ঝুনঝুনওয়ালা আদ্যশ্রাদ্ধ নামক ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ করে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট। নামের সঙ্গে কাজের সাদৃশ্য পাওয়া যায় ঘাটে গেলে। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে পাঠকদের জানিয়ে রাখি যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ঘাটের স্থাপত্য অনবদ্য। ব্রিটিশ রাজত্বে ভিক্টোরিয়ান নির্মাণশৈলী ঘাটের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। দর্পনারায়ণ ঠাকুর এবং বিখ্যাত পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ বংশধর প্রসন্নকুমার ঠাকুর নামঙ্কিত ঘাটের উন্নতির দায়িত্ব রয়েছে কলকাতা পুরসভার হাতে। আশেপাশে ছড়িয়ে আছে নোংরা আবর্জনা। ঘাট-সংলগ্ন ওভারব্রিজের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক। দ্বিপ্রহরের শেষ দিকে যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন দেখা গেল অল্পসংখ্যক কয়েকজন ক্ষৌরকর্ম সেরে গঙ্গাস্নান করছেন। এছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে ঘাটের কয়েক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন কৌতূহলী স্থানীয় কিছু মানুষ।

নদীতে তখন ভরা জোয়ার। জোয়ারের স্রোতে ভেসে চলেছে কুচরিপানা সহ হরেক রকম বর্জ্য পদার্থ। গঙ্গাস্নানে রত অপরিচ্ছন্ন মনের ময়লা সেই দলে আছে কিনা জানা নেই। আপাতত গ্রীষ্মের প্রখর তাপ উপেক্ষা করে উত্তর কলকাতার গঙ্গাতীরবর্তী অন্যান্য ঘাটগুলির কথা জানতে আমরা এগিয়ে চলি জোয়ারের স্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

সুফি সোনা গাজি এশিয়ার বৃহত্তর সোনাগাছি

পান্থজন

কালো রঙের শাড়ি পরা শ্যামলা মেয়েটি এদিক-ওদিক ঘোরে, চোখে তার চটুল দৃষ্টি। উলটো ফুটে দাঁড়িয়ে দেখি, মন বলে, ‘বেণীমাধব বেণীমাধব তোমার বাড়ি যাব, বেণীমাধব তুমি কি আর আমার কথা ভাব?’ কোনও নির্দিষ্ট বেণীমাধব নয়, পথে প্রতিদিনই নতুন নতুন বেণীমাধব এসে হাজির হয়। সেই নিত্য নতুন বেণীমাধবকেই সে ভালোবাসে, হয়তো-বা তাকেই জিজ্ঞেস করে, ‘কেমন হয় আমিও যদি নষ্ট মেয়ে হই?’ হ্যাঁ, সমাজ ওদের নষ্ট মেয়েই আখ্যা দিয়েছে। আজ পথ আমায় এনে দাঁড় করিয়েছে সেই ‘নষ্ট’ মেয়েদের সামনে। কিন্তু তারা কি সত্যিই নষ্ট?

সোনাগাছি অঞ্চল হল এশিয়ার বৃহত্তম রেডলাইট এরিয়া। সোনাগাছি এই নামের পশ্চাতে থাকা ইতিহাসটি হল, সুফি সম্প্রদায়ের সোনা গাজি নামক এক সাধকের মাজাহার অর্থাৎ সমাধি রয়েছে ওই এলাকায়। সেই থেকেই এলাকার নামকরণ করা হয়েছিল সোনা গাজি যা আজ অপভ্রংশে হয়েছে সোনাগাছি। উত্তর কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, শোভাবাজার, বিডন স্ট্রিট এবং রবীন্দ্র সরণির একাংশ জুড়ে এই পল্লিতে রয়েছেন প্রায় ১৩,০০০ কর্মী। চিৎপুর রোডের যে-অংশে এই পল্লির সীমানা, সেখানে দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির দপ্তরের এক আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল এই পেশায় যাঁরা যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের অনেকেই প্রতিদিন এখানে আসেন এলাকার বাইরে থেকে। অপ্রাপ্তবয়স্কা অর্থাৎ ১৮ বছরের নীচে যে সব মেয়েরা এই কাজে যোগ দিতে আসেন, এক বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের বয়সের হিসাব করে যদি দেখা যায় তাঁরা ১৮ বছর পার করেননি, সেক্ষেত্রে দায়িত্ব নিয়ে এই কমিটির সঙ্গে যুক্ত মহিলারা বাড়ি পাঠিয়ে দেন। এলাকায় এমন অনেক বাড়ি রয়েছে যেখানে কর্মীরা আসেন, পেশায় যুক্ত হন এবং বিশেষ একটি সময়ের পরে সেখান থেকে চলে যান।

প্রশ্ন করে জানা গেল, বিভিন্ন বয়সের পুরুষেরাও এখানে নিয়মিত আসেন দিনের বিভিন্ন সময়ে। তাঁদের মধ্যে স্কুলের ছাত্র থেকে শুরু করে সত্তরোর্ধ্ব প্রবীণ মানুষেরাও আছেন। আছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে সমাজের উচ্চবিত্ত এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও। গত কয়েক বছর ধরে দুর্বার মহিলা সমন্বয়ের উদ্যোগে এখানে আয়োজিত হয় দুর্গাপুজোর। কিন্তু ২০১৫ সালে পুজো মণ্ডপের আয়তন বাড়াতে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হন। বর্তমান বছরে এঁরা আবারও চেষ্টা করছেন যাতে পুনরায় পুজো শুরু করা যায়। এলাকার কিছু অংশ ঘুরে দেখা গেল অনেক বিবাহিতা মহিলারাও এই পরিষেবায় যুক্ত হচ্ছেন। দুর্বার সমিতিসহ একাধিক সমাজসেবামূলক সংস্থা এইচআইভি রোগ সম্পর্কে এই পল্লিতে সচেতনতা বিষয়ক কাজ করে চলেছে। এতে সুফলও মিলছে। সমিতির এই আধিকারিক জানালেন, এলাকায় অপ্রাপ্তবয়স্ক বা স্কুলের ছাত্ররা এলে তাঁদের পুলিশের ভয় দেখিয়ে এবং বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কথাবার্তা বলে বেরিয়ে রাস্তায় পা রাখতেই মনে পড়ল আদিযুগের কথা। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ব্যবসা বলে একে আখ্যা দেওয়া হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই এই ব্যবসার প্রচলন দেখা যায়। নারীতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর বহুগামিতার কথা শোনা যায়। পরবর্তীতে সামন্ততন্ত্রেও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট নারীর অবস্থান দেখা যায়। সাহিত্যে, উপন্যাসে, সিনেমায় আমরা যে রক্ষিতাদের কিংবা বাইজিদের পাই তাঁদেরও সমাজ ‘নষ্ট’ মেয়ে হিসাবেই গণ্য করেছে। ব্রিটিশ রাজত্বে পুজোর সময় জমিদারবাড়িতে বাইজি নাচ ছিল সাহেবের মনোরঞ্জনের অন্যতম বিষয়। আবারও মনে হল, সত্যিই কি এরা ‘নষ্ট’? রাস্তার হাজারও কৌতূহলী চোখে, বক্র দৃষ্টিতে যে লালসা রয়েছে, তাতে মনে হয় আমরা কতটা অমানবিক, কারণ এই অমানবিক আমরাই ছদ্মবেশ নিয়ে রাতের ভ্রমর হয়ে নিশিপদ্মের মধু খেতে এই পল্লির বিভিন্ন ঘরে ঠাঁই নিতে পিছপা হই না। ভেবেও দেখি না এই ‘নষ্ট’ মেয়েরাই সমাজের কতটা ভারসাম্য বজায় রাখছে।

ফোটো: লেখক

কতটা নিরাপদ রাতের কলকাতা?

তন্ময় মণ্ডল

বড় বিচিত্র শহর এই কলকাতা। তার অলিতে-গলিতে যেমন রয়েছে বহু বছরের পুরনো ইতিহাস তেমনি রহস্যময়তার ছাপ। দিনেরবেলা ব্যস্ত শহর, ট্রাফিক জ্যাম, গাড়ির শব্দ, মানুষের কোলাহল। ব্যস্ত রাস্তা জুড়ে গাড়ির সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষের ব্যস্ততা। দিনেরবেলার এই ছুটে চলা শহরটা একেবারে অন্যরকম থাকে রাতে শান্ত, স্নিগ্ধ। তবুও এই শান্ত কলকাতাতেই ঘটেছে একের পর এক অপ্রীতিকর ঘটনা। গৃহবধু থেকে আইটি কর্মী, সল্টলেক থেকে ডানলপ— সবার ভেতরেই রাতে বাড়ির বাইরে থাকা মানেই অজানা ফোবিয়া। ট্যাক্সি-ড্রাইভার থেকে পাহারাদার, সহযাত্রী বা সহকর্মী, নিরাপত্তার বেড়াজাল কতটা শক্ত? কতটা নিরাপদ মহিলারা এই শহরে? একের পর এক ঘটে চলা ঘটনাতে কতটা নড়ে বসেছে প্রশাসন? কতটা নিরাপদ রাতের কলকাতা? সেই নিয়েই আজকের যুক্তি-তর্ক-আড্ডা।

সমীর আইচ (চিত্রশিল্পী): এখন আমি রাতে রেরোই না, যখন বেরোতাম তখন দেখেছি রাতের কলকাতায় সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে পুলিশ। মানুষ যাঁদের ওপর ভরসা করে, তাঁরাই সবচেয়ে ভয়ংকর। তার কারণটা হল সিকিউরিটি দেওয়া তো দূরে থাক, অযথা মানুষকে ধরে হ্যারাসমেন্ট করে পুলিশ। দ্বিতীয় কথা, এই যে আমরা শুনছি নাইট ক্লাব বন্ধ করে দেওয়া উচিত। নাইট ক্লাব কেন রাত্রিবেলা চলে? আমার প্রশ্ন হল, তাহলে নাইট ক্লাব কি সকাল ছ'টা থেকে শুরু হবে? সারা পৃথিবীতে নাইট ক্লাবে কই এত অসভ্যতা তো হয় না! সেখানে সিকিউরিটির ব্যবস্থা আছে। আসলে পুলিশ-প্রশাসনের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য বিভিন্ন কথা বলা হচ্ছে। যেমন কিছুদিন আগে মণিকা বলে মেয়েটির মর্মান্তিক মৃত্যু দেখলাম। সেখানেও পুলিশের যে ভুমিকা দেখলাম তাতে আমি শুধু না, আমার মনে হয় সকলেই স্তম্ভিত। পুলিশ সাতদিন-দশদিন পর রক্তের নমুনা নিচ্ছে ওই রকম একটা বীভৎস ঘটনার পরও! এগুলো আমাদের এখানেই সম্ভব। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো থাকলে সেটাই মুশকিল। এই ব্যবস্থা যদি ঠিক হয় আমার মনে হয় রাতের কলকাতা সেফ হবে, কারণ আমাদের ভারতেই কিন্তু মুম্বই আছে, বেঙ্গালুরু আছে, চেন্নাই আছে। ওখানে কখনও এতটা আনসেফ মনে হয় না যতটা আমাদের কলকাতায়। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক।

রমেন দাশগুপ্ত (কন্যাসন্তানের অভিভাবক): আমার মেয়ে কগনিজেন্টে চাকরি করে, অনেক রাতে বাড়ি ফেরে এটা আমাদের কাছে একটা প্যানিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা একদমই নিশ্চিন্তে থাকতে পারি না প্রতিদিন যা সব ঘটনা ঘটছে, খুবই ভয়াবহ। আমাদের রাতের ঘুম চলে গেছে। আমার একটাই মেয়ে চার বছর হোস্টেলে থেকেছে, তবু ওর মা চায় ও অফিসের কাছেই কোথাও থাকুক, পেইং গেস্ট বা যেভাবেই হোক। অফিস গাড়িতে করে পাঠায় ঠিকই কিন্তু সেখানেও-বা নিরাপত্তা কতটা? এখন যা অবস্থা ড্রাইভার বা কলিগ কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। প্রশাসন যদি নিরাপত্তা ব্যাবস্থার দিকে আর একটু জোর দিত বা এই সেফটি নিয়ে ভাবতো তাহলে হয়তো আমাদের মতো অনেকেই একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

দীপন যাদব (ওলা-ড্রাইভার): আমাদের ওলা, উবের বা ট্যাক্সি ড্রাইভারদের রাতেও সারা কলকাতা ঘুরতে হয়। চোখের সামনে অনেক ঘটনাই ঘটে। কখনও নিজের সেফটির কথা ভেবে এড়িয়ে যেতে হয়। অনেক ট্যাক্সি ড্রাইভারদের বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ আছে। তবে ওলা-উবের অনেকটাই সেফ, কারণ এখানে আপনি সবটাই ট্র্যাক করতে পারবেন কোথায় যাচ্ছেন, কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, ড্রাইভারের নাম, ফোন নম্বর। রাতে কলকাতার রাস্তায় অনেক জায়গাতেই দেখেছি পুলিশের যেখানে ভূমিকা থাকার কথা ছিল সেখানে পুলিশ নিষ্ক্রিয়। অনেক ট্রাফিক চৌকিতে আলো জ্বললেও পুলিশ থাকে না। ডানলপ ক্রসিং বলুন বা ইএম বাইপাস অনেক কিয়স্কেই আলো নেভানো থাকে রাতে, আর আলো জ্বললেও পুলিশকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে কিছু জায়গায় পুলিশি টহল ভালো। আর একটা ব্যাপার হল, রাতে পুলিশের হ্যারাসমেন্ট সহ্য করাটা খুব সমস্যা আজকাল, কারণে-অকারণে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন।

জয়েন্ট সিপি হেড কোয়ার্টার (সিপি ব্যস্ত আছেন বলে সিপি-র পিএ কথা বলেন): রাতের কলকাতার নিরাপত্তা ব্যাবস্থা এখন আরও জোরদার হচ্ছে। একজন ডেপুটি কমিশনার আর দু'জন অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনারের আন্ডারে পুলিশি টহল চলে প্রত্যেকদিন রাতে। ডেপুটি কমিশনার বাই রোটেশন এবং একজন অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার পুরনো কলকাতার এরিয়ায় এবং একজন কমিশনার অ্যাডেড এরিয়ায় অর্থাৎ নতুন যে-অংশটা যোগ, হয়েছে তার মধ্যে তো সারভেনাস চলেই। তাছাড়া সমস্ত থানা, সমস্ত ট্রাফিক তো আছে। ট্রাফিকের তরফ থেকেও একজন অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার এবং একজন ইনস্পেক্টর প্রত্যেকদিন রাতে নাইট রাউন্ডে থাকেন। প্রত্যেকটা ডিভিশনের তরফ থেকে একজন অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার এবং একজন ইনস্পেকটর, থানার ওসি বা অ্যাডিশনাল ওসি তাঁদের ডিভিশনের ক্ষেত্রেও নাইট রাউন্ড করেন। প্রত্যেক ট্রাফিক গার্ডে দু'জন করে সার্জেন এবং তাঁদের সাথে কনস্টেবল থাকে। তার সাথে ডিভিশনাল মোবাইল ও গাড়িগুলো থাকে সেগুলো রাতে টহল দেয় প্রতিনিয়ত।

ফোটো: সুজয় চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা to কলকাতা (পাঁচের পাতার পর)

অনেকক্ষেত্রে বইও গ্রহণ করা হয়েছে বদান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে। কখনও কখনও পাওয়া গেছে বড় পৃষ্ঠপোষক। অধিকাংশ লাইব্রেরিতেই বই বসে পড়ার ও বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সামান্য মাসিক চাঁদা এবং জমানো অর্থের বিনিময়ে পাঠক পেয়েছেন তাঁর চাহিদার বই। একজন গবেষক বলেছেন, সাধারণ লাইউব্রেরিগুলোতে উপন্যাসের বই-ই সত্তরভাগ; কবিতার বই সবচেয়ে কম, পাঁচভাগ মতো, বাকিটা নাটক-ছোটগল্প-প্রবন্ধ-ইতিহাস ইত্যাদি। বলা বাহুল্য বড় লাইব্রেরিগুলোতে এর পরিসংখ্যান মিলবে না। ইতিহাস-দর্শন-ধর্ম-রাষ্ট্রনীতি-সমাজতত্ত্ব-জীবনী বিজ্ঞান থেকে শুরু করে রান্নাবান্না, ফুলচাষ, শরীরচর্চা, ছবি-আঁকা, সংগীত, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, লোক-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ের বইয়ের সংখ্যাই হবে সত্তর হাজারের বেশি। বড় লাইব্রেরিগুলোয় এ ছাড়াও আছে ম্যাপ, পুঁথি, বিভিন্ন বিষয়ের জার্নাল, সাময়িকপত্র ইত্যাদি। এলাকাভিত্তিক লাইব্রেরিগুলোয় এসব নেই। কোনও কোনওটিতে দু-একটি জার্নাল বা সাময়িকপত্র রাখা হয়। আর রাখা হয় কয়েকটি খবরের কাগজ। এই কাগজ পড়া পাঠকরা নিয়মিত জমিয়ে রাখেন রিডিং রুমের পরিসর বা লাইব্রেরি কক্ষের সামনের বারান্দা।

সারা দেশের গ্রন্থাগারগুলির সার্বিক উন্নয়নকল্পে মে, ১৯৭২-এ কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন', যার হেড অফিস কলকাতায়। এই সংস্থার উদ্যোগে রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের লাইব্রেরিগুলির সঙ্গেই কলকাতার নথিভুক্ত লাইব্রেরিগুলোতেও নবজীবন সঞ্চারিত হয়। এলাকায়-এলাকায় লাইব্রেরিগুলি পঠন-পাঠন ও সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

কিন্তু এখন এই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে দেখা যাচ্ছে লাইব্রেরিগুলো কেমন মলিন হয়ে গেছে। রিডিংরুমের টেবিলে ধুলো জমছে, বইয়ের র‍্যাকে মাকড়সার ঝুল। 'সাইলেন্স' লেখা কাঠের কাগজ-চাপা আর কাজে লাগে না। মধ্যাহ্নে শোনা যায় চড়ুইয়ের উৎসব বা পায়রার বকবকম। সারাদিনে যে কতিপয় পাঠক বই জমা দিয়ে নতুন বই নিতে আসেন, অথবা বসে খবরের কাগজ পড়েন তাঁদের চোখে ভারী চশমা, মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে, অথবা নেই। যৌবন লাইব্রেরি থেকে সরে গেছে দূরে।

বিগত শতকের শেষদিক থেকে প্রায় সমস্ত লাইব্রেরিতে এসেছে কম্পিউটার; বড় বড় লাইব্রেরিতে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, ম্যাপ, গ্রন্থ ডিজিটালাইজ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ই-লাইব্রেরি চালু হয়েছে এ শতকের প্রথম দশক থেকে। পোর্টাল খোলা হয়েছে প্রায় প্রত্যেক লাইব্রেরির। কিন্তু এত আয়োজন কাদের জন্য? সংরক্ষণই কি প্রধান কথা? অন্যদিকে কর্মী নিয়োগ হয়নি বহুকাল, কোনও কোনও লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিয়ানও নেই। পড়ন্ত বেলায় কর্মী হিসাবে এখনও যাঁরা রয়ে গেছেন তাঁরা বিষণ্ণমুখ, সময়ের কাছে নিজেদের দায় নির্বাহ রেখে যাচ্ছেন।

নবপ্রজন্মের অ্যান্ড্রয়েডে গুগল খুলে চলছে ডাউনলোড-আপলোড, ই-লাইব্রেরির পাতা ওলটানো। আজকের এই বাস্তবতাকে মধ্য-পঞ্চাশ যে চোখেই দেখুন, যাঁরা একদিন ফিরবে বলে আশা করেছেন, অনেক তাঁরা এখনও ফেরার কথা ভাবেনি।

লেখক চাপরা বাঙালঝি মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৯ মে ২০১৭

প্রয়োজনে লাগতে পারে

সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স - ২২৪৮৫২৭৭

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যাম্বুলেন্স) - ২২৩৯২২৩২, ২২৩৯২২৩৩

বেল ভিউ নার্সিং হোম - ২২৪৭৭৪৭৩, ২২৪৭২৩২১

কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট - ২৪৫৬৭০৫০, ২৪৭৯২৫৬১

ক্যালকাটা হসপিটাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ - ২৪৫৬৭৭০০, ২৪৭৯১৮০৫

এসএসকেএম হসপিটাল (পিজি) - ২২২৩৬০২৬, ২২২৩৬২৪২

ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ - ২২৪১৯০১, ২২৪১৪৯০৪

বিএম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টার - ২৪৫৬৭০০১, ২৪৫৬৭০০৫

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল - ২৫৫৫৭৬৭৬, ২৫৫৫৭৬৫৬

এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল - ২২৪৪৩২১২, ২২৪৪৩২১৭

পিয়ারলেস হসপিটাল - ২৪৬২২৩৯৪, ২৪৬২২৪৬২

উডল্যান্ডস - ২৪৫৬৭০৭৯, ২৪৫৬৭০৭৬

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান - ২৪৭৫৩৬৩৬, ২৪৭৫৩৬৩৮

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ২৯ মে ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

এক নিভৃত স্বপ্নের উপত্যকা— শহর কলকাতা

জগলুল আহম্মদ সুমন (চিত্রশিল্পী)

ফোটো: প্রাণতোষ পাল

আসলে কলকাতার কথা লিখতে বললে কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখব বুঝতে পারি না। কলকাতা আমার খুব প্রিয় শহর। আমার হৃদয়ের খুব কাছের শহর। এক নিভৃত স্বপ্নের উপত্যকা— শহর কলকাতা। কলকাতার সাথে আমার প্রথম দেখা হওয়ার সালটা ছিল ১৯৯৭। ভাইঝি পড়ত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে, ওর অসুস্থতার জন্য তড়িঘড়ি কলকাতা গেলাম। তবে সেই মুহূর্তে কলকাতা শহরটাকে ঘুরে দেখা হয়নি ঠিক করে। এরপর অনেকদিন কলকাতার সাথে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। ২০১৩ সালে কলকাতা এলাম একটি আর্ট এগজিবিশনে অংশ নিতে। এবারে সুযোগ ও সময় দুটোই পেলাম কলকাতা শহরটাকে নিজের মতো করে ঘুরে দেখার।

সময়টা নভেম্বর-ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। শহরে সবেমাত্র শীত উঁকিঝুকি মারছে। আমরা একটা ১২ জনের টিম কলকাতা এলাম। শিল্পীদের থাকার ব্যবস্থা হল মারকুইস স্ট্রিটের একটা হোটেলে। তিনদিনের ছবি প্রদর্শনী শুরু হল অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে। সার্কের অন্তর্ভুক্ত আটটি দেশের প্রতিনিধিরা এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিল। তিনদিনের এই কর্মশালায় সব দেশের অংশগ্রহণকারী শিল্পীরাই তাঁদের সেরা কাজটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন।

এই প্রথমবার কলকাতা শহরটাকে পরখ করে দেখার সুযোগ হল। আমি আর আরেক শিল্পীবন্ধু সিরাজ ঠিক করলাম যে ছ'দিন ওখানে থাকার সুযোগ হয়েছিল, সেই দিনগুলো উপভোগ করব। এগজিবিশন শুরুর দিন থেকেই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষদের সাথে পরিচয় হতে লাগল, পরিচয় হতে লাগল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পীদের সাথে। ভারত বলায় অবশ্য আমার আপত্তি আছে; তারা না হয় ভাগ করে দিয়ে গেছে, তবে কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে দুই বাংলার প্রাণভোমরা একই।

তিনদিন এগজিবিশন আর কনফারেন্সের চাপে শহর ঘুরতে বেরোনো হল না। শুধু নিউমার্কেট থেকে রবীন্দ্রসদন আর রবীন্দ্রসদন থেকে নিউমার্কেট। নিউমার্কেট জায়গাটা একটা খুব জমজমাট জায়গা। এত দোকান এত মানুষ... প্রথমদিন আমি শুধু দেখে গেছি কত রকমের মানুষ। কী রকম ভিন্ন ভিন্ন তাদের আচরণ, রুচিবোধ।

এগজিবিশন শেষ হবার পর আমরা, মানে আমি, সিরাজ আর কলকাতার শিল্পী জগন্ময় রায় কলকাতা ঘুরতে বেরলাম। তিনি হলেন আমাদের গাইড। আমাদের যাত্রা শুরু হল দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরের চিড়িয়াখানা থেকে। তারপর সায়েন্স সিটি। খুব সুন্দর। আমি মুগ্ধ প্রযুক্তির শৈল্পিক এই উপস্থাপনায়। তারপর সেখান থেকে কালীঘাটে অভিজিত দণ্ডপাঠ, জগন্ময়দার বন্ধু তার বাড়িতে গেলাম। তিনিও শিল্পী, তাঁর সাথে ছবি নিয়ে আলোচনা চলতে চলতে সন্ধে হয়ে গেল। জগন্ময়দা আমাদের ছেড়ে দিলেন কালীঘাট মেট্রোতে। মেট্রোতে এই প্রথমবার চড়লাম। মাটির তলা দিয়ে একটা লোহার জন্তু পেটে করে এতগুলো মানুষকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভারি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এসপ্ল্যানেড নামলাম। সেই রাতটা কাটল।

পরেরদিন আবার বেরোলাম, দেখলাম ভিক্টোরিয়া, বিড়লা তারামণ্ডল, সেন্ট পলস চার্চ, মোহরকুঞ্জ আর নন্দনে তো আগেও গেছি। রানি ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিতে তৈরি হওয়া এই পার্কের ভেতরে একটা কেমন যেন মোহময় পরিবেশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রেমিক-প্রেমিকাদের বিভিন্নরকম ক্রিয়াকলাপ পরবর্তীতে আমার অনেক ছবির বিষয় হয়েছিল।

শেষদিনে আমরা ঘুরলাম কলেজ স্ট্রিট, বাবুঘাট, আর শোভাবাজার রাজবাড়ি— তিনটে আবার তিন মাথায়। তবে বাগবাজারের গঙ্গার পাড়ে বসে ফুরফুরে হাওয়া খাওয়ার স্মৃতি ভোলার নয়। অনেক টুকরো টুকরো স্মৃতির কোলাজে কলকাতা, প্রিয় কলকাতার স্মৃতি লুকিয়ে আছে বুকের বন্ধ ডালাটার ভেতর। মাঝে মাঝেই তা আবেগের টানে বেরিয়ে আসে।

প্রিয় বন্ধু @ কলকাতা *(তিনের পাতার পর)*

রাজেন্দ্রনাথের ব্যস্ততা দিন দিন বাড়ছে। ইমারতি ব্যবসার পাশাপাশি রাজেন্দ্রনাথ এখন কুলটিতে গড়ে তুলেছেন লৌহ-ইস্পাত কারখানা। গ্রামে গ্রামে তিনি পাতছেন বেসরকারি রেললাইন। ব্রিটিশ ভারতে সেই প্রথম বেসরকারি রেল পরিষেবা চালু করেছেন তিনি। কিন্তু সেই পরিষেবা শুধু গ্রামাঞ্চলের জন্যে। গ্রামগুলির উন্নতি না হলে দেশ এগোবে কী করে! সম্প্রতি ব্রিটিশ সরকার তাঁকে মন্ত্রিসভায় জায়গা দিতে চেয়েছিল সেই প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন রাজেন্দ্রনাথ। তিনি মন্ত্রী হতে চান না। বাণিজ্য তাঁর প্রাণ তিনি বাণিজ্য নিয়েই জীবন কাটাতে চান। কলকাতায় যে কোনও সাহেব উদ্যোগপতির থেকে তাঁর বিত্ত আর কৃতিত্ব অনেক বেশি। অবিভক্ত ভারতের তৃতীয় শিল্পপতি তিনি। তাঁকে সমীহ করে বাঙালি সমাজ স্যার রাজেন মুখার্জি বলে উল্লেখ করেন। বাঙালি সমাজে তিনি অফুরন্ত সম্মান, সমাদর পান। কিন্তু পরাধীন ভারতের গ্লানি, পরাধীন দেশের নাগরিক হবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অপমান তাঁর বুকে জমে থাকে। সেই পরাধীন দেশের না বলা কথাটি হল এটা যে কাজেকর্মে তোমার যতই কীর্তি থাক। তুমি যত সফল, যত শিক্ষিত হও। তোমার সবচেয়ে বড় পরিচয় তুমি কালা আদমি। সাহেবদের থেকে নীচে তোমার সামাজিক আসন।

স্যার রাজেন মুখার্জি প্রায়ই যান মধ্য কলকাতায় অবস্থিত বিখ্যাত বেঙ্গল ক্লাবে। কিন্তু কোনও না কোনও সাহেবের অতিথি হয়ে তাঁকে যেতে হয় সেখানে। বড়লাট লর্ড মিন্টোর দেওয়া নৈশভোজে তিনি আমন্ত্রণ পান। কিন্তু তিনি বেঙ্গল ক্লাবের সদস্য নন। তিনি কারুকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন না ওই অভিজাত ক্লাবে। একদিন তিনি বেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে সদস্য হতে চেয়ে আবেদন করলেন। তাঁর আবেদন নাকচ হয়ে গেল। তিনি দুনিয়ায় সাড়াজাগানো স্থপতি। অবিভক্ত ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পপতি। তাহলে কেন তিনি কলকাতার বেঙ্গল ক্লাবের একজন সাধারণ সদস্য হতে পারবেন না?

তিনি ওখানে সদস্য হতে পারবেন না কারণ তিনি ভারতীয়। ভারতের বুকে অনেক বড় বড় ক্লাবে চূড়ান্ত সফল ভারতীয়রাও মেম্বার হতে পারেন না। কারণ কেউ ভারতীয় হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে একই ক্লাবে সদস্য হয়ে যাবে এতে ভারতে বসবাসকারী ব্রিটিশ ভাবাবেগে প্রবল আঘাত লাগবে, ব্রিটিশকুল এতে দারুণ অপমানিত হবে। বেঙ্গল ক্লাব থেকে প্রত্যাখ্যাত হবার কিছুদিন পরে স্যার রাজেন মুখার্জি নিজের উদ্যোগে লোয়ার সার্কুলার রোডে গড়ে তুললেন এক বিলাসবহুল, ঝাঁ চকচকে ক্লাব। কে ভারতীয়, কে ইংরেজ এসব দেখে সেই ক্লাবে কাউকে মেম্বার করা হবে না। বরং ভারতীয়রা যেখানে সামাজিকভাবে মেলামেশা করবে সাহেবদের সঙ্গে। কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে সেই ক্লাবের সূচনা হল। ব্রিটিশের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে, ব্রিটিশরা যেন ক্লাবের কালচার দেখে সমীহ করে। তাই ব্রিটিশের সম্ভ্রম আদায় করতে গিয়ে ক্লাবের কোণে কোণে যেন প্রোথিত হল ব্রিটিশেরই পতাকা। স্যুট বুট টাই ছাড়া ক্লাবে শুধু পরা যাবে বাঙালি ধুতি পাঞ্জাবি। যে কোনও ক্যাজুয়াল পোশাক নিষিদ্ধ হল। পা খোলা চটি, গোল গলা পাঞ্জাবি পাজামা পরে ক্লাবে ঢোকা চলবে না। মেয়েদের পোশাক নিয়ে নিদান দেওয়া যেহেতু বিলিতি সভ্যতা মতে অসভ্যতা তাই মেয়েদের পোশাকে কোনও বিধিনিষেধ রইল না। তবে ঐতিহ্যবাহী এই ক্লাবে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হল মেয়েদের সদস্যপদ। বাবা মারা যাবার পর নিজের মা একার চেষ্টায় বড় করেছিলেন স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে। সেই মানুষটি যখন কলকাতার সবচেয়ে অভিজাত ক্লাবটির গোড়াপত্তন করলেন তখন তাঁর সেই ক্লাবে সেখানে মেয়েদের সদস্য হওয়া নিষিদ্ধ রইল। ঔপনিবেশিক ইংরেজ কালচারে মেয়েরা শুধু মিসেস এটা সেটা ওটা; শুধুই কারুর স্ত্রী, সাজানো ডলপুতুল। মেয়েদের নিজেদের কোনও ব্যক্তিপরিচয় স্বীকার করে না ঔপনিবেশিক সভ্যতা। ফলে মেয়েরা সাজুগুজু করে ক্লাবে আসবে স্বামীর বাহু আঁকড়ে। কিন্তু মেয়েরা নিজে ক্লাবের মেম্বার হবে সেটা নৈব চ। তেমনি আবার ইংরেজ কালচারে বড়দের আসরে বাচ্চারা ঢোকে না। তাই ক্লাবে বাচ্চাদের ঢোকা বন্ধ রাখা হল। বাচ্চাদের এই বিষয়টিতে অবশ্য ব্রিটিশ মনোভাব বিজ্ঞানসম্মত। বড়দের আসরে বসে বাচ্চারা বোর হয়। আর বেশিরভাগ বয়স্কই ছোটদের সঙ্গে কিছু কৃত্রিম আদিখ্যেতা করতে পারেন শুধু। ইংরেজরা মনে করত শিশু মনস্তত্ত্বের কিছুই না বুঝে বড়দের আড্ডায় ছোটদের নিয়ে আসাটা ছোট-বড় কারুর জন্যেই স্বাস্থ্যকর নয়।

স্যার রাজেন ব্রিটিশের ঔপনিবেশিকতার প্রতিবাদে একটা এতবড় অভিজাত ক্লাব প্রতিষ্ঠা করলেন, অথচ ক্লাব গড়ে ব্রিটিশকে দেখিয়ে দিতে চেয়ে তিনি যেন ব্রিটিশের আর একটি উপনিবেশ গড়ে তুললেন লোয়ার সার্কুলার রোডে। ব্রিটিশের চোখে সর্বাঙ্গসুন্দর হতে হবে বলে স্যার রাজেন মুখার্জি আর তাঁর বন্ধুবর্গ তাঁদের ক্লাবে শুধু ব্রিটিশ কালচার প্রতিষ্ঠা করলেন তাই নয়; ইংরেজ সরকার পরাধীন ভারতের ওপর যেসব ঔপনিবেশিক নিয়ম চাপিয়েছিল সেইসব নিয়মকে সযত্নে তাঁদের ক্লাবে লালন করা শুরু করলেন তাঁরা। ক্লাবের দেওয়ালে, ছবির ফ্রেমে, মাখনে-রুটিতে, মেহগনি কাঠের আসবাবে ঝলসে উঠল ব্রিটিশ উপনিবেশ। তারপর কত বছর কেটে গেল। দেশ স্বাধীন হল। সাহেব-মেমরা প্রায় সকলে ভারত ছেড়ে চলে গেল। যুগ বদলালো। কিন্তু স্যার রাজেনের ক্লাব থেকে ইংরেজ উপনেবেশের পাঠ চুকল না। কিছুদিন আগেও মহিলারা মেম্বার হতে পারতেন না সেখানে। এখনও সেখানে পা খোলা চটি, কলার ছাড়া জামা, জিনস, পাজামা নিষিদ্ধ। প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গাঁধি তীব্র প্রতিবাদ না করলে সহজে মেয়েদের সদস্য হওয়া শুরু হতো না সেখানে। গাঁধিজির উত্তরসূরি গোপালকৃষ্ণ ক্লাবের অন্তরে একটা পরাধীন ভারতের রেপ্লিকা দেখেছিলেন বোধহয়। তিনি প্রশ্ন তুললেন, মহিলারা শুধু মিসেস অমুক বা তমুক বা শুধু কারুর স্ত্রী নন, তাঁরা পুরুষের সমকক্ষ। তাঁরা কেন শহরের ঐতিহ্যবাহী প্রধান ক্লাবে সদস্য হতে পারবেন না? গোপালকৃষ্ণর প্রশ্নের মুখে পড়ে স্যার রাজেনের ক্লাবের বাইরের ঔপনিবেশিকতা খানিকটা ভেঙেছে। বদলে যাওয়া যুগের দাবিতে তাঁর ক্লাবের দেওয়াল অলিন্দগুলো অনেক কথাই আজকাল মুখ ফুটে বাইরে বলতে পারে না। কিন্তু চুপিচুপি স্যার রাজেন মুখার্জির এই নির্মাণ এখনও পরাধীন ভারতের একটা ছোট টুকরোকে ধরে রেখেছে কলকাতার বুকে। ব্রিটিশের একটা সূর্য রোজ স্যার রাজেনের এই ক্লাবে ওঠে। এবং সেই সূর্য এখান থেকে সহজে অস্ত যাবে না নিশ্চিত।